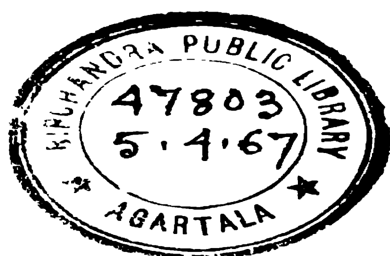
মেয়েরা ও অন্যেরা

শেখর সেন



লিটারারী গিল্ড কলকাতা ১৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীনিতীশ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৫১ জানুয়ারী ১৯৪৪

প্রকাশক : অজিতকুমার ঘোষ
লিটারারী গিল্ড্
১।১ ঘোষাল ষ্ট্রীট
কলকাতা ১৯

মুদ্রক : সুধীরকুমার বসু
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪১ অনাথনাথ দেব লেন
কলকাতা ৩৭

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট
কলকাতা ১২

দাম—তিন টাকা

শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস—

রাইনের তীরে (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

ছোট গল্প সংকলন—

বিদেশিনী (২য় সংস্করণ)

রম্য রচনা—

অদূরে সুদূরে যারা (প্রকাশিতব্য)

ভূমিকা

অত্যন্ত তরুণ বয়সে রম্য রচনা লিখে আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম 'বীরবল' নামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরীর। মৃত্যুর কিছু আগে শান্তিনিকেতনে ডেকে আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁর আশীর্বাদ। সে কথা আজো ভুলি নি।

তাঁর সেই আশীর্বাদ-ধন্য আমার রম্য রচনার বই 'বারো ভূতের হাট'। তার পরেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় রম্য রচনার বই 'অন্তর্জলি'। এ দু'টিই বহুকাল নিঃশেষিত।

এই সংকলনে ঐ দু'টি বইএর কয়েকটি রচনা সন্নিবিষ্ট হল। বাকীগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বইএর মধ্যে সেগুলির একত্র প্রকাশ এই প্রথম।

আমার রম্য রচনার জন্যে আরো যাঁদের কাছে উৎসাহ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীঅন্নদাশংকর রায় এবং শ্রীবুদ্ধদেব বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

'কবি ফাল্গুনী' এই রচনাতে ফাল্গুনীর যে শেষ কবিতাটি দেওয়া হয়েছে, সেটি দীর্ঘ কবিতা। অংশ বিশেষ মাত্র তুলে দিয়েছি প্রয়োজন অনুযায়ী। ইচ্ছে আছে ফাল্গুনী রায়ের সমগ্র কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করার। অনেক কাল আগে বুদ্ধদেব বসুর উৎসাহে ফাল্গুনীর মৃত্যুর পর তার বারো খানি নির্বাচিত কবিতা নিয়ে 'কবিতা ভবনে'র পক্ষ থেকে প্রকাশ করেছিলাম 'বারোটি কবিতা'। সে বই আজ আর পাওয়া যায় না কোথাও।

এই বই প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায় অনেক সাহায্য করেছেন—সে কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি।

আর স্মরণ করছি তাকে, যে আমার রম্য রচনা অত্যন্ত ভালবাসে—যার উৎসাহ ও তাগাদা না থাকলে এই বই আজ প্রকাশিত হত না!

শেখর সেন

মেয়েরা

কামিনী কাঞ্চন

বুক কিপিং

লটারী

খবরের কাগজ

চাকার গান

রবীন্দ্র নাথের পরে

ছাদ

জগন্নাথের রথ

কোকিলের ডাক

লজ্জার কথা

দুর্ নীতি

কলকাতা-কালচার

সম্বন্ধ

শিল্পীর নগদ বিদায়

ভারতের রাজনীতি

পেভ্‌মেণ্ট ম্যান

কবি ফাল্গুনী

মে য়ে রা

যে মেয়েটি তির্যক চোখে আপনার দিকে চেয়ে আছে ভুলেও মনে করবেন না যে সে আপনাকে দেখছে। মেয়েদের চেয়ে থাকা আর দেখার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই যে মেয়েটি আপনার দিকে চেয়ে আছে ভেবে (এবং সেটা আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন) আপনি পুলকিত হচ্ছেন, মাঝে মাঝে রুমাল বার করে মুখ মুছচেন, ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে উঠছেন, ভুবন দোলায় হৃদয় দুলছে ; একটু কষ্ট করে ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবেন ঐ মেয়েটির লক্ষ্য মানুষ আপনি নন, আপনারই পাশের বাড়ীর বারান্দায় দণ্ডায়মান ছেলেটি। এখানেই কম বয়সের মেয়েদের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। যেমন কিনা তারা যখন যাকে লক্ষ্য করে তার প্রতিই সবচেয়ে উদাসীন ভাব, আছে কি নেই। একটি মানুষকে শিখণ্ডি খাড়া করে তার আড়ালে দৃষ্টিটা অপর জনের প্রতি চালিয়ে দেওয়া একটা মস্ত কৃতিত্ব ও ক্ষমতার ব্যাপার। একে শিল্প বলা চলে এবং সব মেয়েই চোদ্দ থেকে চৌত্রিশ পর্যন্ত শিল্পী।

যে কোনো মেয়ে আপনাকে চোখের চাহনি দিয়ে, আমাকে মধুর হাসিতে, রামকে ভাব ভঙ্গিমায়, শ্যামকে হতাশায় এবং হরিকে আশা দিয়ে অনায়াসে এক সংগে একই সময়ে যুগপৎ অভিভূত পুলকিত গদগদ ও তথাগত করে তুলতে পারে। আপনার জীবনে রাম শ্যাম হরি বা মধু হবার সৌভাগ্য বা সুযোগ না ঘটে থাকলে

আমার এ-কথা বুঝতে আপনার দেরী লাগবে—চাই কি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েও উঠতে পারেন। আপনি তুখোড় তার্কিক হলে আমার কাল্পনিক মূর্তি সামনে খাড়া করে তর্ক ফেঁদে বসবেন, প্রেমিক হলে ব্যথা পাবেন, রসিক হলে খুশী হবেন, বেরসিক হলে বলবেন আমি একজন গোঁড়া নারীদ্বেষী, নয় হতাশ প্রেমিক। আপনাদের প্রত্যেকের কথা স্বতন্ত্রভাবে মেনে নিয়েও এ টুকু বিনয়ের সংগে বলতে পারি যে, আপনারা তাহলে কেউই মেয়ে দেখেন নি। রাগ করবেন না, মেয়ে বলতে আমি যা বুঝি আপনি হয় ত তা বোঝেন না, আবার আপনার যা ধারণা সকলের ধারণা এক নাও হতে পারে। যেমন একজন নারী সম্বন্ধে বলে গেছেন তারা নরকের দ্বার, আর একজন বলেছেন অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা! কেউ বলেছেন দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

মেয়েরা নিজেরা যা বোঝে না তাই পুরুষদের বোঝায়, যা করে না বা পারে না তাই পুরুষকে দিয়ে করায়, যা জানে না তাই পুরুষকে জানাতে উঠে পড়ে লাগে। আদম ঈভের সময় থেকে দেখুন। আমার কথার মর্ম বুঝবেন। আদম বেচারী নিরীহ ভালো মানুষ, সাতে নেই পাঁচে নেই, খায় দায় সুখে বেড়ায়; ঈভ তাকে নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে ছাড়লে। আধুনিক ঈভেরা কোন অংশে তাদের পূর্ব-নারীদের (পূর্ব পুরুষের স্ত্রীলিংগ) চেয়ে স্বতন্ত্র? দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিবর্তনবাদ একমাত্র নারীদের কাছেই হার মানল। নারীদের মনের কোনো বিবর্তন নেই। ভারতের অতি প্রাচীন ঋষি বাক্য দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা, আর সর্বাধুনিক কালের ঋষি মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতেও নারী রহস্যময়ী। তার সবটুকু জানার উপায় কই? তিনি অসামান্য চেষ্টা করে সামান্য মাত্র জেনেছেন।

যাই হোক যা বলছিলাম—যে কোনো মেয়ে আপনার চোখে নীল আকাশকে সবুজ, সবুজকে লাল, সাদাকে কালো দেখাতে পারে এবং আপনি যদিও মনে প্রাণে আজন্ম জানেন যে আকাশের রং নীল, তবু মেয়েদের কথায় আপনার নিজের মনেই খটকা লাগবে তাই ত সবুজ হতেও পারে, সবুজ নয়ই বা. কেন ? নিশ্চয়ই সবুজ। অতএব মেয়েদের কথা আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য তা যদি তারা টানা চোখের কোণে বাঁকা ভঙ্গী করে বলে।

মেয়েদের সংগে আপনি মিশুন, প্রাণ খুলেই মিশুন, এর অর্থ এ নয় যে সকল মেয়েকেই আপনার হৃদয় মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করতে দিন। ভেতরের দুয়ার সব সময়ে চাবি দিয়ে রাখবেন এবং আপনার চাবিকাঠি হবে শঙ্করাচার্যের বাণী 'নারী নরকের দ্বার।' দেখবেন আপান নানা রকমের (তরুণীই বেশী) একাধিক মেয়েদের সংগে মিশছেন, গল্প করছেন, হাসছেন তাদের কথায় সায় দিচ্ছেন, মান অভিমানের পালা চলেছে, তাদের কথায় উঠছেন, বসছেন নাচছেন এবং আপনার পূর্বপুরুষের মতো আপনার নাচ দেখে মেয়েরা হেসে লুটোপুটি, অবশ্য মনে মনে, প্রকাশ্যে তারা দেখাচ্ছে যেন আপনার প্রেমে 'হাবুডুবু', আপনাকে না হলে জীবন ব্যর্থ, আর এ সব শুনে আপনি আনন্দে রোমাঞ্চে একেবারে আত্মহারা, অবশ্য বাইরে, মনে মনে আপনি বিলক্ষণ জানেন নারী নরকের দ্বার। এবং বাধ্য হয়ে লোকে মৃত্যু বরণ করে বটে, কিন্তু নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে কেউ রাজী নয়। অতএব মেয়েরা যাই করুক, আপনি নীলকণ্ঠ মহাদেব। নারীর হৃদয় ও সুবিধে থাকলে অধরের বিষ পান করে 'বুঁদ' হয়ে থাকুন। কাল যখন দেখবেন আগের দিনের মেয়েটি আপনার দিকে ফিরেও চাইছে না, যেন চেনেই না, জীবনে এই প্রথম আপনাকে দেখছে, আপনি নীলকণ্ঠ মহাদেব তার প্রতি ঠিক সেই অজ্ঞান ও ব্রহ্মচারীসুলভ

'দৃষ্টিপাত করে অন্য মেয়ের প্রাত মনোযোগ দেবেন।

আসলে মেয়েদের চেনা মোটেই শক্ত নয়। তাদের সম্বন্ধে বহুকাল থেকে যে সব রহস্যময়তার অবতারণা ও কিম্বদন্তি চলে আসছে সে সব শুধু মেয়েদের ভোলাবার জন্যেই। এর মূলে অন্য কোনো গভীর কারণ ব সত্য নেই। মেয়েদের মন পাবার কৌশল হিসেবে পুরুষের এই সব উদ্ভাবন। আর কিছু নয়। কথাটা হয় ত দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। একটু পরিষ্কার করা যাক। ধরুন আপনি খুব জবরদস্ত লোক এবং আপনার কাছে আমার কোনো বিশেষ স্বার্থগত প্রয়োজন। অথচ আপনার কাছে এগোনোই দুষ্কর কারণ আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব ভাল নয়, তবু এগোতে হবে, এখন নমস্কার ঠুকে বা বয়স্ক স্থলে প্রণাম সারার পর যদি আমার প্রথম কথা হয়, 'আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, একেবারে ভেঙে পড়েছে।' তাহলে আপনার জবরদস্ত মন ভেজাবার পক্ষে আমার এই প্রথম কথাই যথেষ্ট। মানুষ নিজের সম্বন্ধে যেমন কখনোই ভাবে না যে সে সুখী বা সুস্থ তেমনি তাকে দুঃখী ও ও অসুস্থ বলে আমি যদি জানাই তাহলে সে আমার ওপর খুশী না হয়ে পারে না। মানুষের এমনি অসংখ্য দুর্বলতা আছে যেখানে ঘা দিলে অনেক লাভ হতে পারে। যেমন কোনো মানুষকে আমি যদি বলি যে আপনাকে ভয়ানক মিষ্টিক বলে মনে হয়, আপনাকে যেন ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। অসংখ্য মানুষের মধ্যেও আপনি স্বতন্ত্র, একক, তাহলে সে ভদ্রলোক কোনদিন মিষ্টিক না হলেও আমার কথায় মুখের ভাবখানি মৃদু মন্দ হাসিতে ভরে তুলবেন—তার অর্থ এই যে ঠিক চিনেছ! এবং আমি যে তাঁকে ঠিক চিনেছি এতো আপনি বেশ বুঝতে পারছেন! এটা মেয়েদের বেলায় আশ্চর্য খাটে। বহুকাল থেকে মেয়েদের মিষ্টিক বলে চালিয়ে আসায় ফল হয়েছে এই যে অল্প বিস্তর সব মেয়েই নিজেকে

'মিষ্টিক' ভাবে এবং আপনি যদি তার মনের বীণার এই 'মিষ্টিক' তারে ঘা দিতে পারেন তাহলে মেয়েটির সমস্ত মনোবীণাই আপনার সুরে ঝংকৃত হয়ে উঠবে। আপনাকে 'সুদৃষ্টি'তে দেখতে তার তখন কোনো বাধাই থাকবে না।

মেয়েরা যে কোনোদিনই রহস্যময়ী নয় তা যে কোনো একটি মেয়েকে দেখে বোঝা যায়। তাদের এই রহস্যময়তা পুরুষের সামনে নিজেকে ধরবার জন্যেই এবং এই ব্যাপারে সমগ্র নারীজাতির মৌলিক সাদৃশ্য অখণ্ড ও আশ্চর্য ঐক্য। এ ক্ষেত্রে সবার এক কায়দা, এক অস্ত্র এক বিদ্যা এক ভাবভঙ্গি। প্রেম নিবেদন মান অভিমান সব মেয়েদের এক রকম। যে কোন একজনের চলাফেরা ভাবভঙ্গি কায়দা কানুন বেশ ভালো করে নিরীক্ষণ করুন পরে অন্য একটি মেয়ের সংগে সে সব মিলিয়ে দেখবেন, হুবহু এক। কাজেই একটি মেয়ে সমস্ত মেয়েদের বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট। অনেকটা এ্যাল্‌জেব্রার ফর্মুলার মতো। একটি ফর্মুলায় অসংখ্য অংক যেমন করা যায়। (অবশ্য প্রত্যেক মেয়েরই মানসিক গঠন অবশ্য এক নয়, কম বেশী তারতম্য সবারই আছে)। ধরুন শিপ্রাকে আপনি খুব ভালো করে চেনেন জানেন এখন শীলাকে আপনার জানা দরকার। শীলার ভাবভঙ্গিমা কয়েক দিন তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, দেখবেন অধিকাংশ বিষয়ে শিপ্রার সংগে মিলে যাচ্ছে—এরপর শীলার মনস্তত্ত্ব শিপ্রা-ফর্মুলা অনুযায়ী বুঝতে আপনার কোনো কষ্টই হবে না। অবশ্য এতে অংক জ্ঞান দরকার নইলে ভুল হওয়া সম্ভব এবং ভুল হলে অনেক ক্ষেত্রে তার ফলও মারাত্মক হতে পারে। কথাটা ঠিক বোঝাতে পারছি না? দৃষ্টান্ত দিই। ধরুন অতসী আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসে; এটা আপনি নানাভাবে জেনেছেন এবং অতসীও ভাবে ভঙ্গিতে জানিয়েছে: অনেক দিন এই রকম যাওয়ার পর একদিন দেখলেন অতসী আপনাকে

ভালবাসে না আর। বা আপনিই তাকে চান না। এখন আপনি বেলার সংগে মিশতে সুরু করলেন। তার সাথে সম্প্রতি আপনার আলাপ হয়েছে। দু'একটি কথা, একটু হাসি, সামান্য কটাক্ষ, লক্ষ্মীটি অমুকদা পর্যন্ত যখন আপনার সংগে আলাপ গড়িয়েছে তখন আপনি অতসীর সংগে আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা মতো বুঝলেন যে বেলাও আপনাকে ভালবাসে, আপনাকে চায়; ব্যস একদিন সুযোগ বুঝে আপনি গদ গদ হয়ে তার কাছে প্রেম নিবেদন করলেন এবং সে উত্তর দেবার আগেই তাকে কাছে টেনে তার বঙ্কিম অধরোষ্ঠে আপনার ওষ্ঠ স্থাপন করলেন। তারপর হল কি? হয় ত বেলা আপনাকে ভয়ানক একটা ধাক্কা দিল কিংবা গালে একটি নরম চড় (যদিও সেটা গরমই লাগবে) দিল বসিয়ে অথবা চিৎকার করে লোক জড়ো করলো। তাদের বললো এ অসভ্য জংলী, আমার অসম্মান করেছে ইত্যাদি। ফলে এই শিভ্যল্‌রি ও যুদ্ধের যুগে বেলার চিৎকারে জড়ো লোকগুলির হাতে আপনার কি দশা হতে পারে ভেবে দেখুন। অবশ্য আপনি হয় ত এতটা ভাবেন নি, অতসীর অভিজ্ঞতাকে বেলার ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছিলেন এই যা। কিন্তু তাহলে কি হয় অতসী অতসীই, বেলা বেলা। এদের প্রভেদ আপনাকে অংক কষে বার করতে হবে। এবং লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে ভুল হচ্ছে কি না! তখন আপনি হয় ত আমার ওপর দোষারোপ করবেন, বলবেন আপনিই ত বললেন যে কোনো একটি মেয়ে সমস্ত মেয়ে জাতের ফর্মুলা। আপনার কথা শুনেই—। ঠিক কথা, কিন্তু পূর্ব যুগে যেমন মেয়েদের পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রিণী, হস্তিনী প্রভৃতি চারটে শ্রেণীতে ভাগ করা ছিল; এই ফ্রয়েডীয় যুগে মনস্তাত্ত্বিক উপশ্রেণী গড়ে উঠেছে, (অবশ্য এ যুগে মেয়েদের আর এক শ্রেণী দেখা যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে 'বাঘিনী' শ্রেণী) এবং মেয়েদের জানতে হলে দৈহিক শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক

উপশ্রেণী প্রথম বার করতে হবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। রমাপতিবাবু একজন অত্যন্ত রাসভারি কড়া মেজাজের লোক। সহজে কথা বলেন না। হাস্য পরিহাসে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি দাবা খেলতে খুব ভালোবাসেন। হরিপদবাবুও দাবা খেলতে ভালোবাসেন এবং হাস্য রসে তাঁর দখল অসাধারণ। আপনি রমাপতিবাবুর রাসভারি কড়া মেজাজের খোঁজ রাখেন না, আলাপ হলে শুনলেন তিনি দাবা খেলতে খুব ভালোবাসেন। হরিপদবাবুর ফর্মুলা অনুযায়ী এখন আপনি যদি রমাপতি বাবুর সংগে পরিহাস করতে যান তাহলে সেটা আপনার পক্ষে অদৃষ্টের পরিহাস হবে না কি? মেয়েদের ক্ষেত্রেও রানু কোন শ্রেণীতে পড়ে দেখুন। কোন দৈহিক শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক উপশ্রেণীতে সেটা জেনে তবে রানুর সঙ্গে প্রেম করতে ভিড়বেন, নচেৎ নয়।

এখন বুঝতে পারছেন নারী মনস্তত্ত্ব অংকশাস্ত্র অনুযায়ী কতখানি সহজ পাঠ্য বিষয়? অংকশাস্ত্রকে যাঁরা বাল্যকাল থেকে ভীতি ও ভাবনার চোখে দেখে অবহেলা করে এসেছেন তাঁদের যদি যৌবন থাকে ত এই বেলা অংকটা ঝালিয়ে নিন, নইলে এ জীবনে মেয়েদের কাছে তাঁদের আশা নেই। আর যাঁরা অংকে বার বার একশ'র মধ্যে একশ পেয়ে এসেছেন তাঁরা এইবার একশ'টি মেয়ের মধ্যে একশ'টিকেই বিদ্ধ করতে পারবেন এই অংকের সাহায্যে। তবে তাঁদের একটু খাটতে হবে। বায়োলজি ফিজিওলজি ও সাইকলজির সমন্বয় না হলে তাঁদের কোনো ফর্মুলা খাটবে না। এ-কথাটা কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। নইলে বিপদ! তখন কিন্তু আমাকে দোষারোপ করবেন না! সেটা এখানেই বলে রাখছি!*

---

* এই লেখাটি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য, মেয়েরা পড়বেন না।

কা মি নী কা ঞ্চ ন

অনেক দেখে শুনে সার বুঝেছি যে কামিনী ও কাঞ্চন অথবা এর যে কোনো একটি পেতে হলে সন্ন্যাসী হওয়া দরকার।

আমার এ কথায় রেগে উঠবেন না। এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার আগে দেশের বর্তমান সন্ন্যাসীদের আস্তানাগুলি একবার ঘুরে দেখে আমার বক্তব্য যাচাই করে নেবেন। দেখতে পাবেন সমাজের বেশ একটা বড় অংশ কি ভাবে অর্থ ছড়াচ্ছে সেখানে আর মেয়েরা (যুবতীদের সংখ্যাই বেশী) দলে দলে কি রকম ভিড় করছে এই সব জায়গায়।

এখানে অবশ্য বলে রাখা ভালো যে নির্বিচারে সকল সাধু সন্ন্যাসীরাই এই দলে নন। যাঁরা সত্যকার সাধক ও ত্যাগী, লোকচক্ষুর আড়ালে যাঁদের সাধনার ক্ষেত্র—তাঁদের নাগাল এ সব জায়গায় মেলে না। আর মেলে না তাঁদের, যাঁরা সংসারে বাস করেও আজীবন নিরাসক্ত সাধকের মতো জীবন যাপন করেন। যাঁরা মধ্যে মধ্যে তাঁদের অলক্ষ্য সাধনার ক্ষেত্র থেকে নেমে এসে কিছুকাল শিষ্যদের মধ্যে কাটিয়ে যান, বিলিয়ে যান অন্য লোকের অমৃতময় তত্ত্ব—তাঁদের কথাও বাদ দেওয়া যায়। আমার এ বক্তব্য তাঁদের নিয়েই যাঁরা ইদানীং সন্ন্যাস ধর্মকে এক 'ব্যবসা' হিসাবে নানাখানে বেশ আসর জমিয়ে বসেছেন আর একাধারে কামিনী ও কাঞ্চন নিয়ে দিব্যি মেতে উঠেছেন।

এক বিশেষ সন্ন্যাসীর কথা শুনুন তবে। এঁকে এই শেষোক্ত

দলের প্রতিনিধি স্থানীয় বলা চলে। তাঁর আস্তানায় একদিন গিয়েছিলাম, ধর্মের আকর্ষণে নয় বলাই বাহুল্য। দেখি প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল, রকমারি সাজে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সাজানো। এক দিকে মঞ্চ। তার ওপর মখমলের গালিচা, তাকিয়া। দু'ধারে রূপোর ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। বাবাজী বসে আছেন, ধ্যান নিমগ্ন চোখ দুটি। সমাধিস্থ যেন। বিরাট প্যাণ্ডেলটি জুড়ে ভক্তদের ভিড়। ভক্তির ছড়াছড়ি। বাবাজীর ওপর তাদের বাহ্যজ্ঞান শূন্য দৃষ্টি। ভক্তদের অধেকের বেশী মেয়েরা। দেখে মনে এলো কবি বিদ্যাপতির দু'টি লাইন,—'মধুর মধুর যুবতীগণ সঙ্গ, মধুর মধুর রসরঙ্গ।'

বাবাজীর চোখের পাতা দুটি ক্রমশ কোঁচকাতে কোঁচকাতে খুলে গেল, ধ্যান ভঙ্গ হল তাঁর। ভক্তরা খুশীতে গদগদ। প্রণাম পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল। বাবাজীর শ্রীপাদস্পর্শের লোভে গেল প্রতিযোগিতা লেগে—কে আগে যায়, কে আগে পায় শত কামনার ধন এক বিন্দু পদরেণু! তাদের ভাবটা যেন বুঝি পায়ের ধুলো ফুরিয়ে এল!

দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। পরণে তাঁর সাহেবী পোশাক, যা এই আসরে বেমানান। তাঁর সঙ্গে অনেকেই এসে কথা বলছিলেন। মনে হল, তিনি এখানে বেশ পরিচিত। আমাকে সেই পাদ-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে না দেখে বললেন, 'আপনি যাচ্ছেন না যে?'

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, 'আপনি যাবেন না?'

'না,' হেসে তিনি জবাব দিলেন, 'মোক্ষ লাভের জন্যে ব্যস্ত নই।'

বললাম, 'খুব ভালো কথা। তবে এখানে কেন? রগড় দেখতে?'

'স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি। তিনি বাবাজীর শিষ্যা।'

'আপনি শিষ্য নন :

'এখনো প্রকৃতিস্থ আছি মশাই। খেটে খেতে হয়। এ সব বিলাসে মত্ত হবার সময় কোথায় ?'

উত্তর দিলাম, 'ধর্মাচরণ স্বামী স্ত্রীর এক সঙ্গে করা উচিত। তাতে ফল ভালো হয়।' তারপরই বললাম, 'তাছাড়া ধর্মাচরণকে বিলাস বললেন কেন ?'

'বিলাস ছাড়া আর কি ?' ভদ্রলোক নাক সিঁটকোলেন একটু, কথা বলতে বলতে বারবার নাক সিঁটকোচ্ছিলেন তিনি। সেটা তাঁর মুদ্রা দোষ, না, এখানকার ব্যাপার স্যাপার দেখে তা কে জানে! 'ও সব জমতো যখন লোকের খাওয়া পরার চিন্তা টিন্তা ছিল না, ঘর বাড়ীরও বিশেষ বালাই ছিল না। বনে বাস করে গাছের ফলমূল খেয়ে ইহলোকে আর কোনো কাজ না থাকায় পরলোক নিয়ে ভাববার সময় পেত লোকে। আর এখন ?'

প্রশ্নটা আমাকেই করলেন তিনি। বললাম, 'এখনো দিব্যি জমছে। দেখতে পাচ্ছেন না চোখের সামনে ? ইহলোকের সব কাজ করেও লোকে পরলোকের কাজ করতে এসেছে এখানে।'

'যত সব রাবিশ!' বলে তিনি আবার নাক সিঁটকোলেন। তারপর বললেন, 'আপনি বুঝি খুব ভক্ত ?'

হেঁয়ালী করে জবাব দিলাম, 'ভক্তির কতটুকুই বা জানি!'

আমার মতো ভক্তের সংস্পর্শে এসে পাছে তাঁরো মনে ভক্তি ভাব সঞ্চারিত হয় সেই ভয়েই বোধহয় তিনি এরপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে সরে গেলেন।

কিন্তু হঠাৎ দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল পাশের দিকে। দেখলাম, শুধু আমার নয়, সমগ্র পুরুষ ভক্তদের দৃষ্টি সেদিকে পড়েছে। তন্বি শ্যামা, লিপষ্টিক অধরোষ্ঠী। পরণে সাদা সিফনের সাড়ী ও লাল চেলি। বব করা চুল, হাতের দশটা আঙুলের নখগুলি

রক্তবর্ণা। সরু দুটি ঘন কালো ভ্রূর নীচে টানা দুটি চোখে বিদ্যুৎ ঝলক। হাতে ঝোলানো সাদা প্লাষ্টিকের ভ্যানিটি ব্যাগ। তিনি একটি মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, কখনো হাসছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তোর মতন সাদা দাঁতের ঔজ্জ্বল্যে ও হাসিতে মোহ বিস্তার করছিলেন চারপাশে।

সমবেত পুরুগ ভক্তদের ভক্তির স্রোত মঞ্চের দিকে না গিয়ে তাঁর দিকেই এবার ধাবিত হল। আর যে সব মহিলারা স্বামীদের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা স্বামীজির কথা ভুলে তাঁদের স্বামীদের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন—বেচারীদের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে তাঁদের মুদ্গর দৃষ্টি দিয়ে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে।

কয়েকজন যুবক ভক্ত আর থাকতে না পেরে এগিয়ে এসে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। তারপর দেখলাম ঐ ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়ে বিজয়িনী চলেছেন বাবাজীর কাছে। বুঝলাম ভক্তরা তাঁকে ভিড় সাফ করে বাবাজীর কাছে নিয়ে যাবার দুরূহ কাজের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন।

আমার সঙ্গে সদ্য আলাপী সেই ভদ্রলোকটি এবার এগিয়ে এলেন আমার দিকে, তাঁর মুখে চোখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। সেই দেখে বললাম, 'দেখে শুনে বিরক্ত হয়েছেন দেখছি। কিন্তু জানেন ত সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। রাজদ্বারে শ্মশানে সন্ন্যাসীর আশ্রমে সবখানে।'

আর কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'উনি আমার স্ত্রী।'

পাশের আর এক ভদ্রলোক আমাদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এলেন। তাঁর স্ত্রীও এই বাবাজীর শিষ্যা। বললেন, 'মশাই সুখ নেই। বাড়ীতে একটা বসরার ঘর ছিল। সেটাকে ঠাকুর দেবতা আর বাবাজীর নানা ছবি ভরিয়ে আর্ট গ্যালারী বানিয়ে তুলেছেন

তিনি। লোকজন দেখা করতে এলে এখন সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলি আর নয়তো নিয়ে যাই সামনের পার্কটায়। দেদার জায়গা সেখানে। কি না ধর্মচর্চা হচ্ছে। দিনরাত বাবাজীর চিন্তা, বাবাজীর কথা! আর এই যে আমি—(এখানে তিনি নিজের সম্বন্ধে একটা বিশেষণ জুড়ে দিয়েছিলেন যেটা আর ভদ্রতার খাতিরে বলা চলে না) সারাদিন খাটবো খুটবো, ঘরে পয়সা আনবো রক্ত জল করে, তার অর্ধেকটা যাবে বাবাজীদের পেছনে। এ দিকে ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকাবার সময় নেই তাঁর। তারা অযত্নে বাড়ছে আগাছার মতো। সংসারটাও রসাতলে যেতে বসলো।'

আমাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে তিনি বলে চললেন, 'অথচ বলার উপায় নেই। দিনরাত ঐ নিয়ে খিটিমিটি। তাই ভাবছি একদিন তুত্তোর বলে বেরিয়ে পড়ব সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে!'

তারপর নিজেই বলতে লাগলেন, 'বলুন ত, গরীবের এ সব ঘোড়া রোগ কি পোষায়! এই সব বড় লোকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমার এ দিকে নাজেহাল অবস্থা!'

অনেক দিন আগে এমনি আর এক আসরে একবার গিয়েছিলাম। সেখানেও ঐ একই অবস্থা। তবে এখানে ভিড়টা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থাৎ পাঁচমেশালি ব্যাপার নয়। ভক্তরা সবাই বেশ বিত্তবান। তাদের তেল চকচকে নাদুস-নুদুস চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদ দেখে কখনোই মনে হয় না যে তারা কখনো ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে আপিস করে; মোটরেই তাদের যাতায়াত; বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়ানো অসংখ্য মোটর দেখে এই ধারণাই হয়। এদের অধিকাংশই বড় বড় ব্যবসাদার, আপিসের কর্মকর্তা, ডাক্তার ব্যারিষ্টার ও শহরের তথাকথিত শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি, মায় ভেজাল ঘিয়ের ব্যবসাদার আছে। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটাই

এখানে উঁচু মার্গের। মহিলাদের সংখ্যা এখানেও বেশী, তাঁদের বয়সও কম। তাঁদের সাজ পোশাক বেশভূষা দেখে মনে হয় তাঁরা ধর্মচর্চা করতে বা ভগবানের নাম করতে এখানে আসেন নি। মনে হয় তাঁরা এখানে এসেছেন তাঁদের রূপ যৌবন ও পোশাক পরিচ্ছদের আভিজাত্য দেখাতে।

এ হেন আসরে হঠাৎ দেখি এক ভদ্র লোক নিতান্ত বিনীত ভাবে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে আসছেন মঞ্চের দিকে। বয়সে প্রৌঢ়, দাড়ি গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, পরণে নিতান্ত মামুলী গলাবন্ধ কোট, দারিদ্র্যের ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে বেশ ফুটে উঠেছে, ধুতিটাও হাঁটুর নীচে খানিকটা নেমেছে। এই রকম দীন মলিন মানুষ এই আসরে একেবারেই বিসদৃশ। সমবেত জনতার সঙ্গে তাঁর তফাৎটা প্রতি পদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অথচ আশ্চর্য, সকলেই তাঁকে প্রচুর খাতির করছে। পথ করে দিচ্ছে সেই ভিড়ের মধ্যেও। কেউ কেউ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে হাসি মুখে।

ব্যাপার কি? বেশ অবাক লাগল। কে ইনি? এই চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদেও যিনি এই আসরে প্রবেশ করার সাহস রাখেন ও সকলের কাছ থেকেই পান সমাদর? ধর্মের ক্ষেত্রে কি আমরা 'সাম্যবাদী' হয়ে উঠলাম?

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁর অল্প পেছনেই আসছিল একটি তরুণী। নারীর রূপ সম্বন্ধে সংস্কৃতভাষী বৈষ্ণব কবিরাই সবচেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন মনে হয়। তাঁদের কাব্যে নায়িকার রূপের যে বর্ণনা পড়ি সেই বর্ণনার সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে এ রকম মিল কখনো যে দেখতে পাবো এ অভিজ্ঞতা আমার নতুন।

আমার পাশের ভদ্রলোকটিকে জিগ্যেস করলাম, 'ঐ বুড়ো

কে? আর তাঁর পেছনে যে মেয়েটি আসছে সেই বা কে?' 'জানেন না কি? বুড়ো ভদ্রলোকটি ঐ মেয়েটির বাবা, বাবাজীর শিষ্য ঐ ভদ্রলোক।' তিনি উত্তর দিলেন। কেমন করে ঐ বাবার এমন মেয়ে হলো এ প্রশ্ন অবান্তর। ভাবলাম যাক অন্তত এই ক্ষেত্রে বিধাতা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। কাঞ্চন দেন নি বটে ভদ্রলোককে, কিন্তু তিনি ঘরে অলোকসামান্য কামিনী পাঠিয়ে কাঞ্চনের অভাব পুষিয়ে দিয়েছেন।

* * * *

বহুদিন ধরে অনেকগুলি আস্তানাতেই ঘুরলাম। দেখে শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই কি তবে আমাদের সমাজের একটা বৃহৎ অংশ ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে? না, এ যুগের এটা ফ্যাশান মাত্র! আমার গুরু আছেন এ-কথা বলার সময়ে শিষ্যদের মুখে চোখে ভাবের যে অভিব্যক্তি দেখি সেটা কি ভক্তির অথবা যুগের ফ্যাশান অনুযায়ী চলতে পারার আত্মতৃপ্তি! ভারী ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থাকলে যেমন আত্মতৃপ্তি আসে?

আর এ দুটোই যদি না হয় তবে এটা কি? কিসের জন্যে মানুষ দলে দলে ছুটে চলেছে এই সব জায়গায়? অকৃপণ হাতে ঢালছে অর্থ! মানুষ কি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে অন্য কোনো আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সেই বিশ্বাসকে ফিরে পেতে চাইছে? না, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস আজ শিথিল হয়ে এসেছে সেই বিশ্বাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে এই ছোটাছুটি? কিম্বা নিজেদের পাপী মনে করে এখানে এসে পাপমুক্ত হবার আশায় এরা জড়ো হচ্ছে এসে!

অথবা এ সব কিছুই নয়। সন্ন্যাসীদের আস্তানাতেই আজ কামিনী ও কাঞ্চনের সংযোগ হচ্ছে বলে আজ সন্ন্যাসীরাই ভিড় টানছে।

এই ভিড়ের মধ্যে যদি নিজেকে হারিয়ে না ফেলেন তাহলে এই প্রশ্ন অতি সহজেই আপনার মনে উঁকি দেবে যে এই ভিড় কেন? কিসের আকর্ষণে এই ছোটাছুটি হুটোপুটি সন্ন্যাসীদের ঘিরে? ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী আগেও এসেছেন। তাঁদের অনেকের মধ্যে বিরাটত্বের পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁদের ঘিরে যে ভিড় হয়েছে সে ভিড়ের সঙ্গত কারণও ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের সন্ন্যাসীদের মধ্যে অলৌকিকত্বর পরিচয় ত কিছুই পেলাম না। আসর জমানো ও লোক টানার ক্ষমতা তাঁদের আছে—এই যা তফাৎ তাঁদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে। নইলে আর সব বিষয়েই ত তাঁরা সাধারণ। তবু তাঁদের ঘিরে শিক্ষিত লোকের এই ভিড় কেন?

অতীতে সন্ন্যাসীদের আস্তানায় ভিড় হত অশিক্ষিত গ্রাম্য সরল মানুষের। যারা মাতুলী তাবিজে বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করত নানারকম আধিদৈবিক প্রক্রিয়ায়। যাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাঁদের ঘিরেও ভিড় ছিল না শিক্ষিত মহলের। কিন্তু বর্তমান সন্ন্যাসীদের ঘিরে ত সেই অশিক্ষিত জনসাধারণকে তত দেখি না, যেমন দেখতে পাই শহরের বিশেষ গণ্যমান্য লোকদের, শিক্ষিত সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে। তাঁরা কি পান এই সব সন্ন্যাসীদের কাছে?

'কেন এসেছেন এখানে?' এমনি এক সন্ন্যাসী সমাবেশে প্রশ্ন করেছিলাম এক ভদ্রলোককে।

'কেন এসেছি?' আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, 'কেন এসেছি তাতো জানি না। টানে নয় নিশ্চয়ই, কারণ আমি বিশ্বাস করি ধর্মচর্চার স্থান ঘরের কোণে নিভৃতে। সভা ডেকে, ঢাক পিটিয়ে নয়।'

আর এক ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম ঐ একই কথা।

তিনিও জবাব দিতে পারলেন না সঠিকভাবে। 'তাই ত, কেন এসেছি এখানে? এ প্রশ্ন ত মনে জাগেনি আগে।'

কেউ উত্তর দিলেন, 'সবাই আসছে, তাই এসেছি।'

অনেকগুলো মানুষকে ঐ একই প্রশ্ন করেছি, যথার্থ উত্তর পাইনি। কিন্তু তাদের নিরুত্তরতায় আমার প্রশ্নের উত্তর যেন পেয়ে গেলুম। মনে পড়ল সাধারণ মানুষদের মধ্যে আছে অসাধারণত্বের প্রতি আকর্ষণ। যারা নিজেদের ছোট মনে করে, বড়কে আশ্রয় করে বাঁচার একটা মনোভাব তাদের মনের তলায় তলায় কাজ করে। নিজেদের অযোগ্যতাকে তারা অন্যের যোগ্যতা দিয়ে পরিপূরণ করে নিতে চায়। বড়দের সংস্পর্শে চায় নিজেরাও বড় হতে। তাই আগেকার দিনে এই শিক্ষিত সমাজের বিরাট একটা অংশ ভিড় করত দেশের মনীষীদের ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীদের কাছে মানুষ ছুটে যেত নিজেদের সেই তাগিদেই। আর তারা পরিতৃপ্তও হত। আজো সে তাগিদটা ঠিকই আছে তাদের মধ্যে, কিন্তু মনীষীরা নেই কেউ। তাদের বদলে আজ শহরের বুকে আসর জমিয়ে বসেছেন সন্ন্যাসীরা, তাঁদের একমাত্র সম্বল আকর্ষণী ক্ষমতার জোরে।

বুক কিপিং

বুক কিপিং অর্থাৎ ব্যবসার হিসাবপত্র রাখার কথা বলছি না. বলছি সেই কলাবিদ্যার কথা যার অভ্যাসে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে পড়ার জন্যে বই চেয়ে এনে আর ফেরত দেওয়া হয় না, যে বিদ্যার গুণে নিজের ঘরের আলমারিতে অপরের বই থরে থরে জমে ওঠে।

একে ত আমাদের দেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যাই কম, তার ওপর এখানে বই-এর পাঠকের চেয়ে বই-এর লেখকদের সংখ্যা বেশী। এ হেন দেশে বই-এর বিক্রী তাই নেই বললেই চলে। যদি বা কেউ কখনো ভুল করে এক-আধটা বই কিনে ফেলে ত সে বই সুন্দরী বউ-এর মতো ঘরে বেশী দিন রাখা সম্ভব হয় না। সহৃদয় বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনেরা নিয়ে যায় পড়তে এবং পড়ে দু'-একদিনের মধ্যেই ফেরত দেবার বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিন্তভাবেই অনেক ক্ষেত্রে কোনদিনই বই-এর মালিককে বইটি ফেরত দেয় না।

ভুল করে যারা সারা বছরে এক-আধটা বই কেনে তাদের কথা ত বললামই। আমাদের বই-এর সংগ্রহ বাড়ে বিশেষ করে একটি মাত্র ক্ষেত্রে-- সেটি হলো বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখবার জন্যে বই উপহার দেবার বেলায়। এক কাঁড়ি খরচ-খরচা ক'রে অতিথি অভ্যাগত ডেকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলে কিছু বই মেলে। বিলিতি কেতায় জন্মদিন পালন করে খাওয়ালেও বই পাওয়া যায়।

অবশ্য জন্মদিনটা কোনো তরুণীর (অবিবাহিতা হলেই ভালো) হলে ত কথাই নেই। খোদ রবীন্দ্রনাথের বই বেশীর ভাগ কাটে এইভাবে, অন্যদের ত কা কথা!

আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে দেখেছি আলমারি ভর্তি বই। বাড়ীটাতে লেখা-পড়ার চর্চা হয় ত তেমন নেই, বা উৎসাহ নেই তেমন সাহিত্য জগতের খবর রাখার, কিন্তু আধুনিক লেখকদের অনেক বই-ই সে সব আলমারিতে সাজানো। একটা আলমারি খুলে খানকতক বই নামিয়ে আনুন, মলাট ওল্টান, দেখবেন সেখানে অন্যের নাম লেখা যে এ-বাড়ীর বাসীন্দা ত নয়ই, এদের আত্মীয়ও নয়। আর একটা বই খুলুন সেখানেও হয় ত দেখবেন আর একজনের নাম। যেগুলিতে কোন নাম নেই সেগুলি অন্যের অথবা যেগুলিতে বাড়ীরই কারো নাম লেখা আছে, খোঁজ নিলে জানবেন সেটি হয় ত মালিকের নাম অলিখিতভাবেই এ-বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলো। এখন তাতে বর্তমান অধিকারীর নাম সমুজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে।

কোন্ কুগ্রহের প্রভাবে জানি না বই কেনার বদ অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিলো। স্কুলে টিফিনের পয়সা জমিয়ে রাস্তার ওপর পাতা বই-এর দোকান থেকে সস্তায় বই কেনা স্বুরু করি। তারপর অনেক বই কিনেছি—কিন্তু আজ আমার সে সংগ্রহের অর্ধেক বই আমার মালিকানায় নেই। সে সব বই যে কোথায় গেলো, অনেকদিন হলো তার খোঁজ করাও ছেড়ে দিয়েছি। একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে বেশ কিছুকাল পরে গেছিলুম। কথায় কথায় বই-এর কথা উঠলো, স্পষ্টই মনে ছিলো বন্ধুটি আমার কয়েকখানি বই পড়তে এনে ফেরত দেয়নি। বললাম সেগুলির কথা। সহজ উত্তর পেলাম সে বই নাকি আমাকে কবে ফেরত দেওয়া হয়েছে! আমার কি স্মৃতি শক্তি লোপ পাচ্ছে! বন্ধুটি আমার জন্যে চিন্তা প্রকাশ করলো। আশ্চর্য হলো আমার এই

বয়সে স্মরণশক্তি হীনতায়। আশ্চর্য আমিও হলাম কিছু পরে যখন তার বই-এর র‍্যাকে আমার সেই বইগুলি আবিষ্কার করলাম। বললাম না কিছুই। বলার কিছু ছিলো না। আজো বুঝতে পারি না, বন্ধুটি ইচ্ছে করেই অতবড় মিথ্যে কথাটি বললো, :না সত্যি তার মনে নেই বইগুলি ফেরত দেয়নি বলে! যাক আমার কাছে দুই-ই সমান।

একটা বই একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছেও যায় এবং হাতের পর হাত ফিরতে ফিরতে কার কাছে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বাঘবন্দী হয়, সে কথা সহজে বলা বা ধরা শক্ত। যার ঘরে আমার বইটি চিরতরে অধিষ্ঠান হলো তাকে হয় ত আমি কখনো দেখিনি বা জানি না। সে হয় ত থাকে বর্ধমানে অথবা মাদ্রাজে। আমার বই চেনাজানার হাত থেকে অচেনা অজানার ঘরে গিয়ে তার সংগ্রহে যুক্ত হলো। তার খোঁজ হারানোর বিজ্ঞাপনের মতো কাগজে দেওয়া যায় না, কাজেই প্রাপ্তির কথাও ওঠে না।

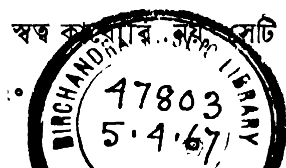
বই টাকার মতই সঞ্চরণশীল। 'নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট' বলা যেতে পারে বইকে। যদি কেউ এর গতিরোধ করে আলমারি-জাত না করে তাহলে এ ঘুরতে থাকলো এক হাত থেকে অন্য হাতে। সূর্যের চার পাশে পৃথিবী ঘোরার মতো হয় ত একদিন আপনার বই আপনার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে এসেও পড়তে পারে আপনার হাতে, এমন সৌভাগ্য যদি আপনার থাকে তবেই। নইলে পৃথিবী ঘোরার মতো, টাকা ঘোরার মতো আপনার বইও ঘুরতে লাগলো।

অথচ বই কিনে এনে আলমারিতে চিরকালের মতো বন্ধ করেও রাখা যায় না সব সময়ে। আধুনিক দুনিয়ায় বউ-এর মতো বইকেও ছাড়তে হয়, আব্রুর মধ্যে রাখা চলে না। নতুন বই আপনার হেপাজতে আছে জানলেই কেউ হয় ত বলবে দিন না মশাই বইটা

একটু। আর যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে বলেছেন যে বইটা ভালো তাহলে তখুনি তিনি বলবেন, বইটা ভালো বলছেন, দিন একটু পড়ে দেখি। ভালো বলার ভালো বিপদ দেখছি! আপনি যদি সতর্ক ও শক্ত না হন তাহলে সে বইকে এরপর ঘরে আটকিয়ে রাখা আপনার অসাধ্য হবে। না বলবেন কেমন করে! সামান্য বই ত! কত আর দাম তার! ভদ্রলোক যখন চাচ্ছেন এত করে! বলছেন পড়েই ফেরত দিয়ে যাবেন! আর কাউকে দেবেন না এ রকম ভরসাও যখন দিচ্ছেন! আর কাউকে তিনি দিলেন না ঠিকই এমন কি বই-এর মালিককেও না। কি করবেন আপনি! দেখা হলে কয়েকবার তাগাদা দেবেন। কিন্তু টাকার মতো অত জোর তাগাদা বই-এর বেলায় চলে না। ভদ্রলোক হয় ত বললেন, আমার পড়া হয়ে গেছে, এবার স্ত্রী পড়ছে। বুঝতেই পারছেন পড়তে চাইলে তাকে না দিই কেমন ক'রে! তারপর স্ত্রীর হলো, ভাই বোনের হলো, ভাই-এর বা নিজের বন্ধুও নিলে। নয় ত তিনি বললেন, আমার পড়া হয়ে গেছে, স্ত্রী পড়ছে এবার। অবশ্য বলেন ত দিয়ে দিই। স্ত্রী না হয় নাই পড়লো। কি বলেন, দেবো কি এনে? ভদ্রলোক আপনার ভদ্রতার ওপর প্যাঁচ কষেন। আপনি কি ক'রে বলবেন নিয়ে আসুন, দরকার নেই আপনার স্ত্রীর পড়ার অতএব বইটি আপাতত রইলো তাঁর কাছে।

আধুনিক সভ্যতার দান হিসাবে আমরা পেয়েছি অনেক ভালো-মন্দ। এই ধরণের বুক কিপিং বিদ্যাটি এমনি একটি।

কিন্তু এও যেন সহ্য করা যায়। কিন্তু যখন দেখি সাধারণ পাঠাগারের বইগুলি পড়তে নিয়ে পাঠকেরা পাতায় পাতায় মন্তব্য লিখেছে, লাইনের পর লাইন লাল-নীল পেন্সিলে বা কালীতে দাগ দিয়েছে—তখনই মেজাজ ঠিক রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। সাধারণ পাঠাগারের বই-এর মালিকানা স্বত্ব কারোরই নয়, সেটি সাধারণের



অর্থে ক্রীত সাধারণের জন্যে সংগৃহীত হয় পাঠাগার দ্বারা। সেই বই পড়তে নিয়ে যখন কোনো কোনো পাঠক পাতায় মন্তব্য লেখে, লাইনের পর লাইন দাগ দেয় তখন সে পাঠক সম্বন্ধে কতখানি উচ্চ ধারণা করা সম্ভব? শিক্ষা দীক্ষার কি পরিচয় পাওয়া যায় এই ধরণের কাজে? যে বই গ্রাস করা সম্ভব হলো না, ফেরত দিতেই হয় তাকে এ ভাবে বিকৃত ও নষ্ট করায় তার কি লাভ হয়?

আমাদের দেশের লোকদের মনের ও শিক্ষার দৈন্যের সবচেয়ে বড় পরিচয় পেলাম সেদিন। একটি বিদেশী পরিচালিত পাঠাগার থেকে একটি বৈজ্ঞানিক বই এনেছিলাম পড়তে। মাঝামাঝি এসে দেখি পর পর দুটি পরিচ্ছেদ তার ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে ও সেই জায়গায় একটি সাদা কাগজে পাঠাগার কর্তৃপক্ষের মন্তব্য লেখা 'পেজ এত টু এত মিসিং'।

আমাদের দেশের লোক যে এতটা নীচে নামতে পারে এ তথ্য সেদিনই প্রথম জানলাম! কি মর্মান্তিক দৈন্য আমাদের! কি হীন মনোবৃত্তি! কি অসহ্য চৌর্যবৃত্তি! নিজেদের বই কেনার বালাই নেই, ইচ্ছে থাকলেও বই কেনার সামর্থ্য নেই, সামর্থ্য থাকলেও উপযুক্ত বই নেই (বিশেষ বিজ্ঞানের), এমন পাঠাগার নেই দেশে যেখানে বৈজ্ঞানিক বই পাওয়া যায়, বই থাকলে পাবার উপায় নেই সহজে!

বিদেশীরা বিনা পয়সায় বই পড়ার দিয়েছে সুযোগ, সে সুযোগের এই ত সদ্ব্যবহার!

আমাদের দেশের দৈন্য সর্বজনবিদিত, কিন্তু দেশের লোকের মনের দৈন্য যে আজ বিদেশীদের কাছে এমন নির্লজ্জভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে, এতে করে কি দেশের গৌরব বাড়লো বিদেশীর কাছে? একে কি বলবো? এই নীচতাকে, এই জঘন্য মনোবৃত্তিকে কোন ভাষায় তিরস্কার করবো! গোটা বইখানা আত্মসাৎ করার

সুযোগ যখন নেই তখন প্রয়োজনীয় পাতাগুলি ছিঁড়ে নেওয়া হলো। এ আমাদের সেই বুক কিপিং বিদ্যার ফল।

আমাদের সর্ব্বব্যাপী দৈন্য এতদিন বস্তুর মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ, আজ মনেও এসেছে দৈন্য। যে জাতির মানসিক সম্পদ নেই সে জাতি সত্যিই দরিদ্র। পৃথিবীতে সে জাতি কৃপালাভেরও অযোগ্য!

ল টা রী

শরীরটা ছিল বেজায় খারাপ, তার ওপর কিছুকাল থেকে পকেটের স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছিল না, সেজন্যে মন মেজাজও ভাল ছিল না। তাই শরীর ও মনের স্বাস্থ্য কিছুক্ষণের জন্যে ফেরাবার লোভে একদিন সন্ধের সময়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম ঢাকুরিয়ার 'রবীন্দ্র সরোবরে'।

কিন্তু ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই যতই হোক সে খোলা মাঠ। সারা শহরে পথে ঘাটে এক মিনিটের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়াবার উপায় কই? ভিড়ের গুঁতোয় এক জায়গায় দাঁড়ানোই দুষ্কর। এই 'রবীন্দ্র সরোবরে'ত নয়ই। তবু অনেক খুঁজে একটি ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেলাম। অন্তত কিছুক্ষণ ত নিঃসঙ্গ বসতে পারবো এই জনারণ্যে!

কিন্তু হায়রে! কৃষ্ণপক্ষের রাত, তাই প্রথমে ঠাহর হয়নি। প্রায় হাত কয়েক দূর থেকেই ভেসে এল একটি অনুচ্চ নারী কণ্ঠ, 'লোকটা আমাদের দেখে ইচ্ছে করে এখানে এসে বসলো!'

একটি হেঁড়ে গলা বললে, 'যত সব শালা ভ্যাগাবণ্ড—'

বসতে না বসতেই একজন বেওয়ারিস বোনাই পেয়ে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। এমন কুটুম্বকে ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করল না। তারা থাকুক তাদের মনে, আমি রইলাম নিজের মনে।

চোখ দুটি না হয় বন্ধ করে রাখতে পারি, কিন্তু কান দু'টো খোলাই ছিল, আর হাওয়াটাও বেরসিকের মতো প্রেমিক যুগলের

দিক থেকেই নিয়ে আসছিল তাদের হাসি ও কথার টুকরোগুলি উড়িয়ে।

মন্দ লাগছিল না।

চারিদিকেই নরনারীর ভিড়, ভ্রমনার্থীদের যাওয়া আসা। মেয়ে বাচ্চা বুড়োদের শোভাযাত্রা।

এ*টি ছোট খাটো দল এসে বসল কাছেই। একটি পুরুষ, চারটি মেয়ে।

একটি মেয়ে বসেই বললে, 'তুমি কিন্তু অসীমদা, কালকের কথা ভুলো না। মনে থাকবে ত?'

অসীমদা বললে, 'নিশ্চয়ই থাকবে।'

আরেকটি মেয়ে একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'হুঁ, অসীমদার সঙ্গে 'ডেট' করেছিস বুঝি? তবেই হয়েছে! তোকে 'মেট্রো'তে ম্যাটিনি শো'তে নিয়ে যাবে বলে দীপালিকে নিয়ে ঢুকবে 'লাইট হাউসে'। ওকে এখনও চিনলি না?'

প্রথমাটি বললে, 'সে সব কিছু না। একটা চাকরির ব্যাপারে এক জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু তোর সঙ্গে এ রকম করেছিল বুঝি ও? কি অসীমদা?'

অসীমদা বললে, 'পাগল নাকি? মেয়েদের সঙ্গে এ্যাপয়ন্টমেন্টে আমি ফেল করি না।'

অন্য একটি মেয়ে ফোঁস করে উঠল, 'ইস, তাই বই কি। সেই যে সেবার টালা পার্কের এক্সজিবিসানে আমাকে নিয়ে যাবে বলে সারা সন্ধ্যে বাড়ীতে বসিয়ে রাখলে! তোমার কথার ঠিক আছে!'

পরপর এতগুলি 'ফ্রন্ট' থেকে আক্রান্ত হয়ে বেচারী অসীমদা চুপ করে গেল। এক সঙ্গে এতগুলি মেয়েকে ম্যানেজ করা কি সহজ কথা!

ছোট বড় গাড়ীরও কমতি নেই। ভোঁ ভোঁ আওয়াজ সপ্তমে

তুলে গাড়ীগুলি চলেছে। কোনো গাড়ীর আরোহীরা গাড়ী থামিয়ে হাঁকছে 'আইসক্রীম।'

আইসক্রীম এল ত, গরম মুড়ি, মুড়ির পর কোকা-কোলা, চীনে বাদাম, নয় ত আর একটা কিছু।

ঠাণ্ডা গরম কোনোটাতেই সর্দি গর্মী হয় না পয়সার গরম থাকলে।

প্রকাণ্ড একটা বুইক এসে থামলো সামনে। আরোহী নামল; আধ-বুড়ো, সঙ্গে তরুণী। মেয়েটির হাত ধরে লোকটি মাঠে নেমে বসলো বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে। লোকটার প্রকাণ্ড ভুঁড়ি মেয়েটির চোপসানো গালের ব্যালান্স রক্ষা করছে যেন!

একটা ভিখিরি এসে দাঁড়াল আমার সামনে। বললে, 'একটা নয়া পয়সা দিন বাবু, আপনার ভাল হবে। ভগবান আপনাকে রাজা করবেন।'

শরীর ও মন কোনোটাই ভাল ছিল না, মেজাজটা চড়েই ছিল। ভিখিরির কথায় আর এক পর্দা চড়লো। খ্যাঁক করে উঠলাম, 'আমি তোমাকে একটা নয়া পয়সা দেবো, আর ভগবান তোমার কথায় আমাকে রাজা বানিয়ে দেবেন! বলি, ভগবানের সঙ্গে তোমার দু'বেলা দেখা শুনা হয় না কি? না ভগবান তোমার হুকুমের চাকর, এ্যাঁ?'

সে একটু হকচকিয়ে গেল, তারপর আবার বাঁধা সুরে বললে, 'একটা নয়া পয়সা দিন বাবু। ভগবান আপনাকে রাজা করবেন।'

বললাম, 'বাপু, ভগবান যদি তোমার কথায় আমাকে রাজা করতে পারেন ত তোমাকে কোন না মহারাজা বানাতে পারেন! তবে তোমার এত দুর্দশা কেন, এ্যাঁ?'

এবার সে বুঝলো নিশ্চয় কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছে, তাই আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়ল।

ভিখিরির সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করি না অবশ্য, তবু আজ যেন কি হয়েছে!

যাই হোক এবার উঠতে হবে। একজনকে এক কালে দু'শো টাকা ধার দিয়েছিলাম। তখন আমার সময় ছিল ভাল, আর তার খারাপ। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে জগৎ! বিপরীত অবস্থা এখন আমাদের। কথা দিয়েছিলো আজ সন্ধ্যের সময় টাকা দেবে। এখান থেকে বহু দূর তার বাড়ী। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। বেশ রাত হয়ে গেছে! গিয়ে এখন তাকে পাবো কি না সন্দেহ। তাই একটা ট্যাক্সি নেবো ঠিক করলাম। পকেটে দু'টো টাকা, ট্যাক্সি ভাড়া হয়ে যাবে। দু' টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে যদি দুশো টাকা আসে! এও এক ধরণের লটারী!

কিন্তু এ সময়ে ট্যাক্সি দুষ্প্রাপ্য। বিশেষ এই 'রবীন্দ্র সরোবর' এলাকায়। কিছুটা হাঁটতেই অদৃষ্ট প্রসন্ন মনে হল। মাথায় আলো জ্বালিয়ে একটি ট্যাক্সি এ দিকেই আসছে। ট্যাক্সি, ট্যাক্সি বলে হাঁকলাম। কিন্তু সে দাঁড়ালো না। পাশ দিয়ে চলে গেল নির্বিকার চিত্তে। কয়েক গজ দূরে রাস্তার অপর দিক থেকে থেকে একটি মিহি সুরে মহিলা হাঁকলেন, ট্যা-ক-সি।

দেখি ট্যাক্সি থেমে গেল, তারপর পিছিয়ে এল মহিলাটি ও তাঁর সঙ্গির কাছে। আমার হেঁড়ে গলা ট্যাক্সি ড্রাইভারের কানে ঢুকল না। মিহি গলা ত বেশ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করল!

সে যাক, চোখের সামনে দিয়ে ত ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল মহিলাটি ও তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে। ট্যাক্সিওয়ালার উর্ধ ও অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ পাশ থেকে আমার নাম ধরে মেয়েলী গলায় কে যেন ডেকে উঠলো। মুখ ঘুরিয়ে দেখি একটি দাঁড় করানো গাড়ীর মধ্যে একা বসে আছে আমার মত পরিচিত একটি মেয়ে।

'কি খবর। এ দিকে যে!' সে প্রশ্ন করলো।

তার প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারলাম না। চোখের সামনে দিয়ে অনেকগুলি বছর ঘুরে গেল পেছন দিকে। মুহূর্তের মধ্যে বর্তমান ছাড়িয়ে অতীতের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

শুনতে পেলাম সে বলছে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। তুমি বিশ্বাস কর!'

আমার হাত খানি তার মুঠোয় ধরা। কাঁদছে সে। চোখ মুখ তার কান্নায় ফুলে উঠেছে।

আমি বললাম, 'তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি নিজে যে এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না! তোমার সাথে নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু আমার মনে এতদিন স্থান পায় নি!'

সে বললে, 'তুমি মিথ্যে বলছ! তুমি অস্বীকার করতে পারো আমাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে আর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি? আমরা ঘনিষ্ঠ হইনি মনের দিক দিয়ে?'

আমি বললাম, 'তুমি আমার সাথে যেমন মেলামেশা বন্ধুত্ব করেছ, ঠিক তেমনি বন্ধুত্ব আরো দু'জন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গেও করেছ! তাদের সঙ্গেও কম ঘনিষ্ঠ তুমি নও! তাই, কেমন করে বিশ্বাস করবো তুমি একমাত্র আমাকেই ভালবাস? তাই, তোমার সঙ্গে নিছক বন্ধুত্ব বজায় রাখা ছাড়া সম্পর্ককে আর এগোতে দিই নি। প্রেমের ব্যাপারে, আমি একনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। তাই, আই জাষ্ট লাইকড্ য়ু এণ্ড নেভার লাভড্ য়ু।'

সে কোনো উত্তর দিল না, আমার হাত ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল।

কয়েক মাস পরেই তার বিয়ে হল এক প্রচুর বিত্তশালীর ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে। তার তিনজন পুরুষ বন্ধুর কারোরি সে বিত্ত বৈভব ছিল না।

'কি হল। একদম চুপ যে! অতীত থেকে ফিরে এলাম বর্তমানে।

হঠাৎ যেন ধ্যান ভঙ্গ হল। হেসে বললাম, 'ভালই আছি। তুমি?'

'আমি?' সেও একটু হাসল, বললে 'গাড়ীতে যারা চড়ে, যাতায়াত করে গাড়ীতে করে, তারা পথ দিয়ে যারা হেঁটে চলে, ট্রামে বাসে যাতায়াত করে,—তাদের থেকে নিশ্চয়ই হাজার গুণ ভালো!'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' আমি বলে উঠলাম, 'মেয়েদের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব তারা চিত্ত থেকে বিত্তকে চেনে বেশী!'

'তা তুমি যাই বল! প্র্যাকটিক্যাল না হলে এ-যুগে চলে না।'

তার ব্যঙ্গোক্তি আমি সহ্য করতে পারলাম না, বললাম, 'জানো, তোমার অবিবাহিত জীবনের পুরুষ বন্ধু অলক, যাকে শুধু দরিদ্র বলেই তোমায় প্রতি তার খাঁটি ভালবাসাকে দু'পায়ে দলে তুমি তোমার বিত্তবান স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হলে, সে আজ তোমার স্বামীর কারখানার একজন ডিরেক্টার। তোমার স্বামী আজ তার চাকর!'

'কি বললে!' মুহূর্তের মধ্যে তার ফর্সা মুখখানির ওপর কে যেন কালির ছোপ মাখিয়ে দিল।

বললাম, 'তোমার পতি দেবতাকেই জিগ্যেস কর অলক বোস তার কোম্পানীর কে!'

খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে বসে রইল সে।

'এবার বুঝলে ত তুমি কত প্র্যাক্টিকাল! আচ্ছা, চলি, কাজ আছে।'

তাকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে এগিয়ে চললাম।

একটু পরেই আমার প্রায় শরীর ঘেঁষেই একটি গাড়ী ব্রেক কষলো। অবাক হয়ে দেখি গাড়ীর চালক আমাদের পাড়ার

ভূতপূর্ব বাসিন্দা এক ছোকরা, পাশে তন্বী শ্যামা, মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুর।

ছোক্‌রাটি একদা রক্‌বাজীতে 'রকশ্রী' উপাধি পেয়েছিল। যত রকমের খারাপ কাজে তার জুড়ি পাওয়া যেত না। মাত্র কয়েক বছর দেখা নেই। সে কি না নতুন 'এ্যামবাসেডার' গাড়ী হাঁকিয়ে সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে চলেছে!

কিম্বা গাড়ী অথবা স্ত্রী কোনোটাই তার নিজস্ব নয়!

'দাদা যে! কেমন আছেন?'

'খুব ভাল।'

'কোন দিকে যাচ্ছেন? লিফট্‌ দিতে পারি।'

এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। পুরুষস্য ভাগ্যং অথবা অন্য কিছু! কোন্‌ উপায় সে, যাতে ধনরত্ন স্ত্রীরত্ন লাভ করা যায়! বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ। আমি এখানে বেড়াবো কিছুক্ষণ।'

'চলি তাহলে।'

সে চলে গেল গাড়ী নিয়ে।

আমি এগিয়ে চললাম ট্যাক্সির সন্ধানে। রাত বেড়ে যাচ্ছে, এরপর হয় ত সে লোকটির দেখা নাও পেতে পারি। আর টাকাটা তাহলে পাবো না। সময় মতো পৌছতে পারিনি বলে বাঙালীর সময় নিষ্ঠার অভাবের কথা নিয়ে মস্ত একটা লেকচার দিয়ে দেবে আর সেই সঙ্গে দুঃখ জানাবে আমাকে সময় মতো না আসতে দেখে সে টাকাটা অন্য কাজে ব্যয় করে ফেলেছে! ভেবেছে আমার বোধহয় টাকা ফেরত নেবার তেমন তাড়া নেই!

ওপরে আকাশের দিকে তাকালাম, নিঃসীম অন্ধকার। পকেটে হাত দিয়ে চেপে ধরলাম এক টাকার নোট দুটি। মনে দু'শো টাকা পাবার আশা!

খ ব রে র কা গ জ

সবে মাত্র খবরের কাগজটি মেলে ধরেছি চোখের সামনে, এমন সময়ে দু'দিক থেকে দু'জন বলে উঠল প্রায় একই সঙ্গে, 'একটা পাতা এ দিকে দেবেন ত স্যার।'

লোকাল ট্রেনে চলেছিলাম নৈহাটি। যাত্রীদের ভীড়ের চাপে কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে বসেছিলাম। অসহ্য গরম। প্ল্যাটফরমে ট্রেণটি দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ না ট্রেন ছাড়ছে ততক্ষণ নিস্তার নেই এই গরমের হাত থেকে। যাত্রীদেরও ওঠার বিরাম নেই। মিনিট দুই বাকী তখনো ট্রেন ছাড়ার।

অবশেষে ট্রেনটি প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে মন্থর গতিতে এগোতেই একটু একটু করে বাইরের হাওয়া ঢুকল। দু'পাশের যাত্রীদের চাপে গুটানো হাত দুটির সাহায্যে যথাসম্ভব বিস্তৃত করে কাগজটি মেলে ধরলাম পড়বো বলে। এমন সময়ে দুপাশের দুটি সহযাত্রীর অনুরোধ, কাগজের পাতা চাই। তাদের দু'জনার দিকে তাকিয়ে একখানা কাগজ মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দুভাগ করে দুদিকে বাড়িয়ে দিলাম। দেবার সময়ে বোধহয় বিরক্তি মেশানো ভ্রুকুটি করেছিলাম, কিন্তু অপর পক্ষ নির্বিকার ভাবে আধখানা করে কাগজ বাগিয়ে বসলেন। কাগজ ছিঁড়ে দিতে দেখে হয় ত অবাক হয়ে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের মুখে চোখে সে ভাব প্রকাশ পেল না।

যদি বলতাম তাঁদের যে, প্রথম পাতার খবরের শেষ অংশ

বেশির ভাগ থাকে পঞ্চম পাতায়, কাজেই দিই কি করে। এখুনি দরকার হবে যে!

শুনে মুখ ভার করতেন তাঁরা, আর নয় ত বলতেন, একটা কাগজই চেয়েছিলাম। টাকা পয়সা না। কাগজটা কি খেয়ে ফেলতাম মশাই? না ফেরত দিতাম না।

এরও উত্তর ছিল। খবরের কাগজ ত একটাই ছাপা হয়নি। হাজার হাজার কপি ছাপা আর বিক্রী হয় প্রকাশ্যেই। কাজেই আমি যদি সংগ্রহ করে থাকি একখানা ত আপনারাই বা আনলেন না কেন কিনে? এতই যদি কাগজ পড়ার শখ!

কিন্তু এ উত্তর মনে এলেও মুখে আনা চলে না। ভদ্রতাতেও বাধে। তাছাড়া স্পষ্ট কথা সামনা সামনি বলার বিপদ অনেক। তার ওপর খবরের কাগজ কিনে পড়ুয়াদের চেয়ে—চেয়ে-পড়ুয়াদের সংখ্যাই দেশে বেশী!

শুধু ট্রেনেই নয়। ট্রামে-বাসে খবরের কাগজ যদি মেলে ধরেন পড়বার জন্যে ত চারপাশ থেকে আপনার সহযাত্রীরা ঝুঁকে পড়বে আপনার ঘাড়ের ওপরে। আমার ত ভীষণ অস্বস্তি লাগে তখন। মনে হয় আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

এত গেল ট্রামে-বাসের কথা। রেস্তোরাঁতেও ঐ একই ব্যাপার। রেস্তোরাঁর মালিক যে কাগজটি এনে রাখে (যেটি তার নিজের পড়বার জন্যে বা খদ্দেরদের জন্যে বা দুই উদ্দেশ্যেই তা জানি না) সেটি নিয়েও কি কম কাড়াকাড়ি লোফালুফি চলে!

কিন্তু সে না হয় হল। রেস্তোরাঁর মালিকের ব্যবসায়ী বুদ্ধি আছে। ঐ কাগজের দামটা সে খদ্দেরদের চপ, কাটলেট, চায়ের দামের সঙ্গেই হয় ত পুষিয়ে নেয়। (না নিয়েই বা উপায় কি! অনেক সময়েই এক বেলার বেশী তার কাগজটা আস্ত থাকে না!)

কিন্তু আপনি যদি কাগজ কিনে হাতে করে কোন রেস্তোরাঁয় ঢোকেন ও অন্যমনস্কভাবে সেটি পাশে রেখে আপনার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে গল্পে মাতেন ত আপনার গল্পের শেষে দেখবেন কাগজটি সে স্থানে নেই। আপনার পরে যে দু'একজন খদ্দের ঢুকেছে রেস্তোরাঁয় তারা সেটি দোকানের কাগজ মনে করে আপনার অনুমতি বা মনোযোগ আকর্ষণ না করেই কোন সময়ে নিঃশব্দে নিয়ে গেছে। আপনি বন্ধুর সঙ্গে এত মশগুল যে টেরও পাননি। যখন টের পেলেন তখন দেখলেন সেটি নিবিষ্ট মনে পড়ছে ঐ কোণে বসা ভদ্রলোকটি। কিন্তু সঙ্গে আপনার সঙ্গী, সঙ্গীনী অথবা সদ্য আলাপিতা, তাঁর সামনে নিজের ইজ্জত ঢিলে করে মাত্র ষোল পয়সা দামের কাগজ চাইতে পারেন না আপনি! অতএব আপনার রেস্তোরাঁর বিলের সঙ্গে ঐ ষোলটা পয়সাও যোগ হল!

সেদিন এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি সিনেমার সামনে। সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ তবু তার দেখা নেই। বাঙালীর নিয়ম-নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছে সে! বোকার মতো রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে হাতের সেদিনের আদ্যোপান্ত পড়া 'কাগজটা আবার পড়া শুরু করলাম। একটু পরে কাগজের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখি পাঠক আমি একা নই। আমার ঠিক সামনেই দু'জন উবু হয়ে পড়ছে কাগজের উল্টো পিঠটা!

পথচারীই হবে হয় ত, নিষ্কর্মা ঘুরতে ঘুরতে দেখল একজন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে পরোপকারার্থে কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। অতএব দাঁড়িয়ে তার কাগজ পড়তে অসুবিধে নেই!

আর একদিন কাগজ পড়ছি লেকের ধারে বসে। সেদিন খুব ভোরে দরকার ছিল লেকের কাছে এক ভদ্রলোকের সংগে দেখা করার। মানে তাঁর সংগে দেখা করার জন্যে লেকটাকেই উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নিইনি, লেকের কাছেই বাড়ী তাঁর। সময়ের

আগেই পেঁৗছে গেছিলাম বলে লেকের ধারে মাঠের ওপর বসলাম একটু সময় কাটাবার জন্যে! সঙ্গে ছিল সেদিনকার সদ্য পাওয়া কাগজখানি।

হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন গলা শুনলাম, 'আজ কোনো বিশেষ খবর আছে নাকি দাদু?'

ভাবলাম বুঝি কোনো বৃদ্ধ ভ্রমণকারীই আমাকে নাতির বয়সী দেখে প্রশ্ন করছেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমারই বয়সী একজন।

একে ত এই 'দাদু' (ষ্টেট বাসের কণ্ডাক্টারদের মুখে হরদম শোনা যায়) কথাটায় আমার ঘোর আপত্তি, তার ওপর সেই কাগজ টানাটানির ব্যাপার। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কোন বিশেষ খবর আপনার পছন্দ বলুন? অনেক খবর আছে।'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে যেন বিস্মিতই হলেন। বললেন, 'বাঃ, কাগজ আপনার হাতে, আর খবর বলব আমি!'

বললাম; 'খবর ত অনেক রকমই হয়ে থাকে। যেমন ধরুন খেলার খবর, রাজনীতির খবর, সিনেমার খবর, আইন-আদালতের খবর, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের খবর। কোন বিষয়ে আপনার রুচি জানলে সেগুলি পড়ে শোনাতে পারি। সমস্ত কাগজ ত পড়ে শোনান সম্ভব নয়। আর যদি নিজে পড়তে চান ত নিন একখানা পাতা।'

আমার এক পরিচিত সাংবাদিক ভদ্রলোকের কয়েকখানা কাগজ আসে। ভদ্রলোক বলছিলেন, তাঁর কাগজই পড়া হয় না বেশীর ভাগ দিন। সকাল বেলায় যখন সকলে কাগজ পড়ে তখন তিনি রেডিও খুলে সকাল বেলাকার খবর শোনেন! আর যদি কাগজ পড়ার একান্ত সাধ হয় ত যখন তাঁর গোয়ালা আসে দোরগোড়ায় দুধ দিতে গরু নিয়ে, তখন তিনি দুধের জাম-বাটি ধরে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে থাকেন কখন হকার এসে কাগজটি ফেলে দিয়ে যাবে তাঁর বারান্দায়। নইলে ঘুম থেকে ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠতে

দেরী হল কি তাঁর দু'টি কাগজ পাড়ার দু'টি বাড়ীতে চলে গেল। তাঁর আপিস যাবার আগে কখনো কখনো কাগজ ফেরত আসে পাড়া-পড়সীদের পড়া শেষ হলে। নইলে আপিসের সময়ের আগে যদি বেরোতে হয় তাঁকে, তাহলে কাগজ দু'টি তাঁর বাড়ী পর্যন্ত আর পৌঁছয় না শেষ পর্যন্ত। পাড়ায় তাঁর গতিবিধির ওপর বেশ নজর রাখা হয় তাহলে কাগজ নেওয়ার ব্যাপারে! কাগজ কোথায় যায় তা তিনি জানেন কিন্তু বলতে পারেন না, চক্ষু লজ্জায় বাধে তাঁর।

আপনি বলবেন, এ তোমার অন্যায়। আমাদের বেশ দরিদ্র, খবরের কাগজ কিনে পড়ার পয়সা তাদের নেই অনেকেরই। কাজেই তারা এমনি করে অপরের কাগজ চেয়ে পড়ে।

যারা দরিদ্র, যাদের কাগজ কেনবার পয়সা নেই তারা আমার লক্ষ্য নয়, তাদের নিয়েও বক্তব্য নয় আমার। আমার লক্ষ্য তারাই যারা অনেক অপ্রয়োজনীয় বা বিলাস উপকরণে আমোদ-প্রমোদে রেস্তোরাঁয় বহু টাকা খরচ করে অথচ খবরের কাগজ কেনবার বেলায় তাদের আশ্চর্য হাতটান! কাগজ পড়বার ইচ্ছা আছে অথচ কিনে পড়ার অভ্যাস নেই। এর জন্যে যে শিক্ষা ও স্বভাবের প্রয়োজন তার প্রচুর অভাব আমাদের জাতীয় চরিত্রে। কাগজ কেনাটাকে অনেকে অপব্যয় বলে মনে করে এ কথা অনেক শিক্ষিত পয়সাওয়ালা লোকের মুখে শুনেছি। তারা বলে যেখানে হোক পড়লেই হল কাগজ, সকলকেই যে কিনতে হবে তার কি মানে আছে। এই মনোভাবের জন্যেই আমাদের দেশে পাঠক সংখ্যা বেশী, বিক্রী সংখ্যা কম সেই অনুপাতে।

অথচ পাশ্চাত্য দেশে খবরের কাগজের সংখ্যাও যেমন অগণিত, তাদের বিক্রী সংখ্যাও তেমনি। সেখানে প্রত্যেকে কাগজ পড়ে। যারা পড়তে পারে তারা কিনেই পড়ে। এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে পড়ে না কেউ। তাদের দেশের শিক্ষার হার আমাদের দেশের

তুলনায় অনেক বেশী এ কথা মেনে নিয়েও বলবো এ-বিষয়ে তাদের আছে জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সেখানে পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, টিউবে প্রত্যেকের হাতে একখানা করে কাগজ। একটা পরিবারে যদি চারজন লোক থাকে ত ঐ চারজনই কিনবে চারখানা কাগজ। ক্রয়-ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থা আমাদের তুলনায় তাদের অনেক বেশী স্বীকার করি, কিন্তু শুধু পয়সা আছে বলেই নয়, এ ধরণের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য তারা শিক্ষা ও অভ্যেস দিয়ে গড়ে তুলেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার হার ভয়াবহ, কিন্তু শিক্ষিতের মধ্যে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার হারও কম ভীতিজনক নয়!

কিন্তু এ ত গেলো একটা দিক। এর অন্য দিকও আছে। খবরের কাগজের জীবন একদিনের, তার মূল্য সাময়িক। আজকের ষোল পয়সার কাগজ কাল আর ষোল পয়সায় বিক্রী হবে না বটে এবং আজকের কাগজের প্রয়োজন দিনের শেষেই ফুরিয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু এর মূল্য ও প্রয়োজন একটি মধ্যবিত্ত সংসারে হয় তখন, যখন বাড়ীর বধূ বা গৃহিণী দিনের পর দিন কাগজ জমিয়ে বেশ কয়েক সের ওজন দাঁড় করান। পুরোনো কাগজওয়ালার কাছে তার দাম এক বা দু'টাকা যাই হোক, সেই টাকায় কত সময়ে কত ছোটখাটো প্রয়োজন মেটে সংসারের। বধূর বা মেয়ের কুমকুম কি সাবান, সিন্দুর এমন কি স্নো পাউডারও কেনা চলে সে পয়সায়। মাসের শেষ ক'দিন যখন আর কিছুতেই কাটতে চায় না, অল্প আয়ের বড় সংসারে নানা দিকে টানাটানি দেখা দেয়, কটা দিন স্বামীর আপিস যাওয়া-আসার ট্রাম-বাস ভাড়া যোগাড় করাও যখন নিত্যকার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তখন ডেকে আনো পুরনো কাগজওয়ালাকে। জমানো কাগজ বিক্রী করে যে টাকা এলো হাতে, তুলে দাও স্বামীর হাতে। তাঁর সাময়িক সমস্যা দূর হোক, মুখে হাসি ফুটুক, বধূর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠুক স্বস্তিতে, খুসীতে!

চাকার গান

ঠুং শব্দে একবার ট্রাম থামে। ঠুং ঠুং শুনে আবার চলতে থাকে।

আপিসের সময়। গাড়ীগুলি ঠাস বোঝাই। ফুটবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরের লোহার রড ধরে আছি। না ধরলেও চলে কারণ আমার সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে মানুষের এমন চাপ যে নড়বার ইচ্ছা বা চেষ্টা করলেও উপায় নেই। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে কার এক বিশাল লোমশ হাত ওপরেব রড বাগিয়ে ধরে রয়েছে, তার চাপে আমার কাঁধে রীতিমত বেদনা অনুভব করছি—কিন্তু হাতের মালিক যে কে জানি না, কাউকে আশপাশে দেখছি না ও-রকম হাতওয়ালা, পেছন ফিরবারও ফাঁক নেই। কোথা থেকে যে এই অদৃশ্য হাত আমার কাঁধে চেপেছে বোঝবার উপায় নেই। দু একবার হাত সরাবার জন্যে স্বগত উক্তি ছাড়ি—কিন্তু সে উক্তি রঙ্গমঞ্চের স্বগতর মত সবার কানে যাবার জন্যে নয়, তা স্বগতই থেকে যায়।

লেডীজ সীটেব গলা শোনা গেল, একটু উঁচু স্বরে, 'আর ভাই বলিস কেন? চীনের যদ্ধও শেষ আমাব চাকরীরও শেষ। এই দু'বছর বাইরে বেরিযে আপিস করে এমন হয়েছে যে ঘরে এক মুহূর্ত মন টেকে না। এবার কি যে করব!'

পাশের সঙ্গিনী হেসে বলে, 'যা বলেছিস। আমারো সেই দশা। বাড়ীতে বসে থাকতে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ছুটির দিনে কি

বিশ্রী যে লাগে। মনে হয় ছুটির কি যে দরকার। সারাদিন বাড়ীতে কাটানো—হরিবল্।'

প্রথম মেয়েটি এবার বেশ নীচু গলায় বলে, 'জানিস, সেদিন গীতাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'কে গীতা ?'

'আরে আমাদের গীতা।'

'কেন, কি করেছে সে ?'

'এক অফিসারের ঘরে নাকি তাকে—'

বলেই থেমে গেল বাকীটা সঙ্গিনীকে বুঝে নিতে ইঙ্গিত করে।

'রোমান্টিক। তারপর ?'

'তারপর আবার কি ? গীতা বলছিল', পার্শ্বগামী বাসের তীব্র শব্দে কথাটা ডুবে যায়। 'যখন কলঙ্কই রটেছে তখন আর—'

মাঝ পথেই সঙ্গিনী বলে ওঠে, 'স্প্লেণ্ডিড। হরে দরে চাকরী গিয়ে প্রমোশনই পাবে তা'হলে।'

সঙ্গিনীও একটু মুচকি হাসে, তারপর হঠাৎ একসময়ে বলে, 'আচ্ছা, তুই কোন দুঃখে চাকরী বাকরী করছিস ?—বড়লোকের মেয়ে, তোর অভাব কি ?'

'শোন কথা ! অভাবটা কি শুধু অর্থের ?'

এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলাম এবার চোখ টান করে এদের দেখলাম। দ্বিতীয় সঙ্গিনী অর্থাৎ বড়লোকের মেয়েটিকে পেছনের দিক থেকেই চিনতে পারলুম—কিছুদিন আগে একেই দেখছিলাম লাইট হাউস থেকে বেরিয়ে আসতে—দু'পাশে তার হস্ত বদ্ধ পুরুষ সঙ্গে, লাল রঙ করা ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গোঁজা। নেটের ব্লাউস শাড়ী পরার ধরণে নারীত্বের সবটুকু সৌন্দর্যই কদর্য অশ্লীলতার মূর্তি নিয়ে সকলের চোখকে তার ওপর থেকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছিল। একজন মস্ত বড় বিখ্যাত লোকের মেয়ে।

আজকের বেশটা কি রকম তা অবশ্য পেছন থেকে বুঝতে পারছি না কারণ সবটাই সীটের আড়ালে ঢাকা·········

ঠুং ঠুং···ঠুং—ঠং ঠং—'এই উল্লুক রোকতা নেই কাহে—'সাহেবী পোশাকে একজন বাঙালী হিন্দী ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলেন। ট্রামটা তাঁর গন্তব্যস্থান ছাড়িয়ে বেশ দূরে গিয়ে থ'মলো। কণ্ডাক্টারও উঁচিয়ে এল, 'আপনি উল্লুক বলবার কে ?—আমি ত ঘণ্টা দিচ্ছি—ট্রাম না থামলে আমি কি করতে পারি ?'

সাহেব গজর গজর করতে করতে নেমে গেলেন। আশে পাশে কণ্ডাক্টর ও ভদ্রলোককে নিয়ে মৃদু মন্দ আলোচনা হয়ে গেল। ভদ্রলোকটির না পোশাক না ভাষা নিজস্ব।

আবার চুপচাপ—শুধু ট্রামের শব্দ আর মাঝে মাঝে ঠুং ··ঠুং ঠং !

'কী মশাই, এবার কাপড়ের কি হবে ? পরব কি ?'

একটি ফাজিল কণ্ঠ ভিড়ের মধ্যে বলে ওঠে, 'কাপড় পরবার দরকার কি ?'

শ্রোতারা একবার বক্তাটিকে দেখবার জন্যে তাকায়, কিন্তু কে যে বক্তা তা তার পাশের লোকটিও জানে না ভিড়ের মধ্যে।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক উত্তর দিলেন ; নেপথ্যেই বলা চলে, 'আপনার না দরকার থাকতে পারে, আমার দরকার আর পাঁচজনের দরকার ! বিবস্ত্র হয়ে ত আর থাকা যাবে না।'

নেপথ্য ব্যক্তির গলা শোনা যায়, 'বিবস্ত্র অবস্থাটা শুধু আপনার একারই হবে না, আর সকলেরও হবে, কাজেই তখন আর কারোরই কারো কাছে লজ্জা পাবার কিছু থাকবে না। তখন Plain living and high thinking, ব্যস। ভাবনা কি !'

বক্তার নির্লজ্জতায় বস্ত্র সমস্যা পীড়িত ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। বুঝলেন, হয় এর অনেক কাপড় আছে নয় ত একেবারেই বেহায়া।

লেডিজ সীটের আরোহিনীদের মধ্যে চোখাচোখি ও ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল।......

একটি মোড়ে ট্রাম থামতেই কয়েকটি মেয়ে এগিয়ে এল। কণ্ডাক্টটার হাঁকল, লেডিজ সীট খালি নেই, পেছনের গাড়ীতে আসুন।

কিন্তু মেয়েরা তবু ভিড় ঠেলে উঠে পড়লো। পুরুষের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তারা জায়গা করে নিল দাঁড়াবার মতো কিন্তু তাদের গায়ের সঙ্গে লেপটে রইল পুরুষের দল! কি করবে উপায় নেই। সরবে কোথায়? তাছাড়া সরবার জায়গা থাকলেও অনেকে এক্ষেত্রে সরে না, বরং ভিড়ের চাপটার সবটাই যেন তার কাঁধে চেপে আছে এমন এক অনিচ্ছাকর ভঙ্গি পরে মেয়েদের নিকটস্থ হতে সচেষ্ট হয়। দৈহিক সান্নিধ্য ও সম্ভ্রম বজায় রেখে মেয়েদের আজকাল ট্রামে বাসে ওঠা অসম্ভব। বিশেষ এই আপিসের সময়ে। এই মেয়েরা যে কোথায় চলেছে জানি না কিন্তু বিশেষ কাজে হয় ত নয়। আপিসের মেয়ে নয় বোঝা যায়। তবু কি এমন কাজ যার জন্যে নিজেদের সম্ভ্রম এমন করে খুইয়ে ট্রামে বাসে উঠতে হবে। প্রয়োজন অর্থাৎ রুটি যোগাড়ের জন্যে যে সব মেয়েদের আপিস করতে হয় তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের অন্য পথ নেই, থাকলেও পাথেয় নেই, কিন্তু যাদের সে সমস্যা নেই তারা কেন এমন করে নিজেদের কলুষিত করে?—ভদ্র অভদ্র সর্ব শ্রেণীর লোক সব সময়ে সব খানেই থাকে। এই ভিড়ে তাদের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করতে হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মন্দলোকে এই ভিড়ের সুযোগ ছাড়ে না, নিজেদের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করে থাকে। মেয়েরা তা অনুভব করে, বোঝে, তবু কেন জেনে শুনে তারা এই আপিসের সময়ে অপ্রয়োজনে ট্রামে বাসে চাপে?

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওদের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন,

'মা এ সময়ে কি তোমাদের ট্রামে বাসে কোথাও না গেলে চলতো না ? ইচ্ছে করলে কি এ ভিড় এড়াতে পারতে না ?'

মেয়েরা চুপ করে রইল।

বখাটে গলায় এবার আওয়াজ এলো, 'বোঝেন না মশাই, মেয়েরাও ত এই ভিড় চায়, পুরুষের সঙ্গে গা-ঘেষে যেতে ভালবাসে। নইলে পুরুষ মানুষই এই ভিড়ে সহজে গলতে পারে না, মেয়েরা দিব্যি গলে যায়। সে কি এমনি !'

শোনামাত্র কানের মধ্যে কে যেন বিষ ঢেলে দিল। ঘৃণায় ধিক্কারে সর্ব শরীর রী রী করে ওঠে। অভিযোগ এত গুরুতর ও ঘৃণ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদ করতে কোথায় যেন বাধলো।

মেয়েরা উঠেছিল হেদোর মোড় থেকে, নামলো বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে, এইটুকু হেঁটেই আসা যেত। হয় ত একটু কষ্ট হত, কিন্তু ইজ্জত বাঁচতো। বকাটে গলার কথা মনে পড়লো !......

এক মোড়ে উঠলো চেকার। একজন বললে, 'এর মধ্যে কোথায় চেক করবে বাবু। নড়বার জায়গা নেই।'

'আমাদের ডিউটি করতেই হবে। টিকিট ! টিকিট !'

আবার সেই ফাজিল অদৃশ্য কণ্ঠ শোনা গেল, 'কত লোক বিনা টিকিটে এতক্ষণে বাড়ী পৌঁছে জিরোচ্ছে—উনি এলেন এখন চেক করতে। যত্ত সব—'

এবার শ্রোতারা হেসে ওঠে।......

যেতে যেতে কানে এল, ক্ষীণ কণ্ঠ—শুনলেই মনে হয় বক্তা অতি বৃদ্ধ। বলছেন, 'বাবা আমি বুড়ো মানুষ, তায় অসুস্থ, একজন কি উঠে একটু বসতে দেবে না ?—আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

একটু পরেই আবার তাঁর কাতর পুনরুক্তি শুনে বুঝি কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নি।

আমি সেখান থেকে একটু দূরে—এগিয়ে যে সাহায্য করব

ভিড়ের দরুণ সে পথ বন্ধ। কিছু করতে না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকি। এমন সময় এল এক মোড়। হুড়মুড় করে সেইদিক থেকে ভিড় ঠেলে নেমে গেল কয়েকটি যুবক। কাবুলি পায়ে, চোঙা প্যাণ্ট-সাটা, বুশ সার্টের কলার তোলা, মুখে কলরব, হাতে খাতা। এরাই এতক্ষণ ঐ সিটগুলি দখল করে পরম আরামে চলচ্চিত্রের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল আর চিত্র তারকাদের বয়স ও পরিচয় নিয়ে রসালো আসর জমিয়েছিল—যাদের কানে অশিতীপর অসুস্থ বৃদ্ধের করুণ মিনতি কানে যায় নি। অকস্মাৎ সমস্ত ব্যর্থ-ক্রোধ যেন ফেটে পড়লো ঐ প্রকাণ্ড অট্টালিকা লক্ষ্য করে। যেখানে বড় বড় শাস্ত্র নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা হয়, যেখানে মহামানবদের মনীষীদের স্মরণ করা হয় প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত, তাঁদের আজীবন সাধনার কথা শেখানো হয়, যাঁরা যে মনুষ্যত্বকে তাঁদের জীবনের সর্বোত্তম ধর্ম বলে জেনেছেন প্রচার করেছেন। এই যে যুবকরা যারা অতি বৃদ্ধকে একটি আসন ছেড়ে দিতে পারে না তারাই শিখবে, তারাই বলবে, তারাই পাতার পর পাতায় খাতা ভরে পরীক্ষা দিয়ে আসবে সেই সব মহামানবদের মনীষীদের জ্ঞানের ও সাধনার আলোচনায়।

এক বড় চৌমাথায় এসে ট্রামটা থামলো। ঠেলাঠেলি করে কতক নামে কতক ওঠে। পুলিস হাত দেখিয়েছে—আমাদের এখন কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে—ও দিকে রুদ্ধ স্রোতের মত গাড়িগুলি চলেছে।

পাশেই এসে থামল একটি মাষ্টার বুইক। প্রকাণ্ড গাড়ী। চক চক করছে রং, চালকটিরও ঝকঝকে পোশাক। আরোহীটির ওপর নজর পড়তেই একটু হাসি এল। বয়স হয়েছে, ছ'য়ের কোঠা পেরিয়েছে, কিন্তু গৌরবর্ণ দেহের চাকচিক্যে, সাদা চুলের কলপ করা টেরি কাটায়, পোশাকের বাহারে, সখ ও সৌখিনতাব চরম

প্রকাশে নব্য যুবকদেরও হার মানায়। নব্য যুবকদের তিনি শুধু এই সাজে সজ্জাতেই পরাজিত করেন নি, তাদের ঈর্ষান্বিত চোখের সামনেই তিনি বহু সুবেশা সুরূপা তরুণীদের নিয়ে গাড়ীতে ভ্রমণ করেন, বাড়ীতে পার্টি দেন, বোটানিক্‌সে পিকনিক করেন। ডায়মণ্ড-হারবারে, ঢাকুরিয়া লেকে, য়ুনিভার্সিটি ইন্স্‌টিটিউটের সভায়, কোনো বিশিষ্ট লোকের মৃত্যু সভায়, বা জন্মবার্ষিকীতে সর্বত্র তাঁর সাজ সজ্জাপূর্ণ উপস্থিতি, সঙ্গে তরুণী বাহিনী। বিপত্নীক, ধনী, গুণী ও মানী। পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু তার ক্ষেত্র—তরুণী সভার গণ্ডীতে। কিন্তু সেখানে পাণ্ডিত্যের পরিসর নেই, আছে নিছক হাল্কা হাসি, চটুল রসিকতার ঢেউ। মেয়েরা কেন তাঁকে পছন্দ করে জানি না, যদি তাঁর ধনের জন্যে হয় তাহলে বুঝব এদেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আর যদি তা না হয় তাহলে ধরতে হবে যে হয় এদেশের ছেলেদের নয় মেয়েদের অকাল বার্ধক্য এসেছে। কোনোটাই দেশের পক্ষে শুভ নয়।

আজো তাঁর দু' পাশে দু'টি তরুণী বসে আছে! ভদ্রলোকের দু'টি হাত দু'জনের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। সেই দেখে ভদ্রলোককে হিংসা করব না মেয়ে দু'টিকে করুণা করব ভাববার আগেই ট্রাম চলতে আরম্ভ করে। গাড়ীটাও মুহূর্তে চোখের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়। ট্রামের আরোহী যারা তাঁকে চেনে এইবার তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে। আলোচনাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।···

সেই ভদ্রলোকের কথা উঠতেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথাও ওঠে। তিনি মস্ত বড় নামকরা ব্যক্তি। প্রগাঢ় পণ্ডিত। বিদেশেও সম্মানিত। তিনি না কি কোন্ এক মনীষীর মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছেন এবং তাঁর বিদেশী স্বীকৃতির মূলেও না কি সেই মনীষীর আপনভোলা চরিত্রের সুযোগে তাঁর জ্ঞানের অপহৃত ভাণ্ডার। তাঁর

এক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটিই না কি এই ভদ্রলোকের হস্তগত এবং তাঁর এই পাণ্ডিত্যের উৎসও না কি সেই পাণ্ডুলিপিটি যার প্রকাশের ভার ছিল তাঁরই উপর।

শুনে যাই, বরং বলি শুনতে হয়। রয়টারের খবর সন্ধানী অত্যুৎসাহী সাংবাদিকরা অন্য কোথাও না ঘুরে একবার এই ট্রামে বাসে চাপলেই বিনাশ্রমে (এক ঝুলতে ঝুলতে যাওয়ার কষ্ট ছাড়া) বিনা খরচে খবরের বিচিত্র ও বিস্তৃত সন্ধান পাবেন। এখানে তাঁরা প্রায় প্রত্যেক লোকের হাঁড়ীর ও বাড়ীর খবর থেকে শুরু করে আশেপাশের প্রকৃতি, মানুষ, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সমাজ, নারীচরিত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুপ্ত তথ্য একাধারে সমগ্র জগৎটাকে এইখানে ট্রামে বাসে চেপে (ধৈর্য ও মাথা ঠিক রেখে যেতে পারলে) পাবেন। কত রকম লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হবে, পরিচয় হবে, কত কি জানতে পারবেন দেখতে পাবেন, যদি অবশ্য আপনার জানবার ও দেখবার ইচ্ছা থাকে কিম্বা যেতে যেতে চোখ কান খুলে রাখেন। একবার ট্রামে কি বাসে চেপে যদি একটু দীর্ঘ পথ যাওয়া যায় তাহলে আপনার সহযাত্রী এই সহরবাসীদের সঙ্গে যেমন আপনার দেখাশুনা হবে, আলাপ পরিচয় হবে—ভাবের আদান প্রদান হবে এমন আর কোথাও কিছুতে নয়। খেলার মাঠে কি গড়ের মাঠের সভায়, কিম্বা সিনেমা থিয়েটারেও আমরা প্রত্যহই অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসি, এক সঙ্গে উঠি বসি, ঘুরি ফিরি, কিন্তু কেউই এমন করে এত সহজে এত স্বাভাবিক ভাবে নিজের মুখ ও মনকে রাশমুক্ত করে না। তাছাড়া সে সব জায়গায় মুখ্য উদ্দেশ্য ও দর্শনীয় থাকে একটি মাত্র বস্তু, খেলা দেখতে কি বক্তৃতা শুনতে অথবা অভিনয় বা ছবি দেখতে গিয়ে আমরা খেলা বক্তৃতা বা ছবির কথাই বলি, অপ্রাসঙ্গিক কথা বড় একটা ওঠে না। উঠলেও তার সহজ ভাব নেই, গভীরতা নেই, মানুষ এমন করে নিজেকে

মুক্ত করে দেয় না বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে। বহু দৃশ্যের সম্ভাবনা সেখানে নেই, তাই বহু বিষয় নিয়েও কথা ওঠে না। কিন্তু এই যে ট্রাম আর বাস, এ চলে সহরের বুকের ওপর দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি। পথে পথে এর বিচিত্র দৃশ্য, ঘটনা, পথে পথে এই নিয়ে আলোড়ন, আলোচনা। গাড়ীর চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা ঘোরে, দৃশ্য ঘোরে, পট পরিবর্তন হয়, পাত্রপাত্রী বদলায়, বদলায় তার বিষয়বস্তু। চক্রের মতই শুধু নয় চক্রের সঙ্গেও পৃথিবী ঘোরে। তাই এক প্রান্ত থেকে যে-জন ওঠে এই ট্রামে বা বাসে, আর নামে আর এক প্রান্তে সে সাথী হয় এই সব মানুষদের, দর্শক হয় এই সব ঘটনার। তার যদি দেখবার চোখ থাকে, শোনবার কান থাকে আর থাকে তা গ্রহণ করবার মতো মন তাহলে মাত্র একবার ট্রামে বাসে চেপে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে তা কোন সংবাদপত্র বা জ্ঞান-গর্ভ বই পড়েও অনেক সময় সম্ভব হবে না।

অকস্মাৎ ধরো ধরো চিৎকারে সচেতন হয়ে উঠি। আগের মোড়ে যে মেয়েটি উঠেছিল, সে চলন্ত ট্রাম থেকেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। অনেকের মতো আমিও উদ্বিগ্ন হই, হাত পা ভাঙল না কি! কি মেয়েরে বাবা! ট্রাম থামলে নামতে পারতো না!

'উঃ, হাত সাফাই বটে! আচ্ছা আচ্ছা পকেটমারদেরও ওপর যায়। কি সাংঘাতিক!'

'কি হল, কে পকেটমার?' প্রশ্ন করি।

'আরে মশাই, ঐ যে মেয়েটি, এখুনি যে লাফ দিল—ঐ ভদ্রলোকের পকেট থেকে পার্স নিয়ে সরে পড়ল! কি ভয়ানক বলুন ত!'

একজন বললে, 'দিব্যি ভদ্রগোছের চেহারা। তারমধ্যে এই!'

অপর একজন বলে, 'কি মশাই, মেয়েটির নরম হাত যখন আপনার পকেটে সেঁধোচ্ছিল তখন বুঝি আরামে আবেশে চোখ বুঝেছিলেন? টের পেয়েও না কি?'

'তা নরম হাতের কিল যদি ভাল লাগে ত চুরি ভাল লাগবে না কেন? কী বলেন মশাই?' আর একজন বলে।

'যার গেছে তিনি জড়িত স্বরে বললেন, 'বুঝতে যে পারি নি তা নয়—কিন্তু অনেক সময়ে বুঝে সুঝেও ন্যাকা সাজতে হয়। ভাবলাম আমার পার্সে আছে ত মাত্র তিরিশ নয়া পয়সা ও কয়েকটা বাজে কাগজ—তার ওপর দিয়ে যদি ব্যাপারটা মেটে, কেন আর ভদ্রলোকের মেয়েকে অপ্রস্তুতে ফেলব। তাই পার্সটা নিতেই দিলুম।'

'অ ব্বা বা, আপনি বেশ খলিফা লোক দেখছি। নমস্কার মশাই, নমস্কার।'

একজন বলে, 'তা আপনার আসল পার্সটি কোথায়? সঙ্গে নিশ্চয়ই।'

'তা ঠিক বলতে পারি না। বললে এবার যদি যায় আসলের ওপর দিয়েই যাবে। নরম হাতের তিরিশ পয়সার বিয়োগ সইবে, কিন্তু শক্ত হাতের তিনশ টাকার বিয়োগ সইবে না। আচ্ছা চলি,' বলেই ভদ্রলোক ঈষৎ মন্থর ট্রাম থেকে নেমে গেলেন।

'তিনশো টাকা!'...সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাশের ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন...আমার টাকা।...আমার যে তিনশো টাকা ছিল...... আমার......ব্যাঙ্ক থেকে তুলে......ঐ লোকটাই আমার পাশে—'

'কি হল আবার আপনার?'

'আমার টাকা......তিনশো টাকা...গেল...সব গেল......'

'এ্যাঁ, আপনার তিনশো টাকা? ঐ ভদ্রলোকেরও ত তিনশো টাকা ছিল সঙ্গে।'

'ঐ টাকা নিশ্চয়ই আমার! ব্যাটা আমার পকেট মেরেছে। উঃ কি শয়তান! আমার টাকা…'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন এবার ধপাস করে বসে পড়লেন এক উপবিষ্ট ভদ্রলোকের কোলের ওপরই।

ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং!……

ধরো ধরো ধরো…একজন নেমেও গেল সেই ভদ্রলোককে ধরতে।…

আমার মনে হল শেষোক্ত ভদ্রলোকটিও বোধহয় কারো কিছু নিয়ে সরে পড়ল। কাউকেই বিশ্বাস নেই।

দেখতে দেখতে ট্রাম লালবাজারের মোড় পেরোল, আপিস পাড়ায় ট্রাম আসতেই টুপ টাপ করে লোক নামতে থাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ট্রামটা ফাঁকা হয়ে গেল।

আমার গন্তব্য স্থান অদূরে। ফাঁকা ট্রামের গদিগুলির ওপর তাকিয়ে থাকি। যারা এল যারা গেল—সকলের মুখ ভেসে ওঠে চোখের ওপর। আর যে ঘটনাগুলি ঘটে গেছে এই স্বল্পকালের রঙ্গমঞ্চে, সে-সব মনে পড়ে গেল। মনে হল যা দেখলুম এ কি সত্যি! মানুষের চরম নিকৃষ্ট রূপটাই আসল ও একমাত্র রূপ? মানুষ কি এতখানি নেমে গেছে? এতখানি তার দৈন্য? অর্থের অভাব, বাসনার অসংযম, শিক্ষার বিকার আজ তাকে এ কোথায় টেনে নামিয়ে এনেছে? এই কি আজ মানুষের সত্যিকার পরিচয়!

লাল দীঘির সামনে এসে ট্রাম থামলো। নেমে দীঘির ভেতর দিয়ে যেতে গিয়ে চোখে যেন ঘন সবুজের অঞ্জন লেগে গেল, সবুজ—যে দিকে চাই সবুজ, দীঘির স্বচ্ছ জল মনকে ভুলিয়ে দিল। সামনেই এক খঞ্জ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে এক অন্ধের টিনে একটা পয়সা ফেলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর দিয়ে যেন একরাশ অন্ধকার সরে গেল—বুকের এক প্রকাণ্ড বোঝা গেল নেমে—অস্ফুট উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠি, এই ত পেয়েছি! মানুষের সত্যিকার পরিচয় এই পেলুম। মন অনাবিল আনন্দে ভরে উঠলো। ট্রামের দৃশ্যগুলি মনে পড়লো—বুঝলাম আমার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়েছে। যে দার্শনিক বিবর্তবাদের আমি ঘোরতর বিরোধী ছিলুম—এবার তাকেই আশ্রয় করে যেন বেঁচে গেলুম—খুশীর আবেগে দ্রুতপদে এগিয়ে চললুম।

রবীন্দ্রনাথের পরে

যুদ্ধের সময়ে দেশ বিদেশ থেকে অগণিত নরনারী এসেছে এদেশে—সৈনিক, অফিসার, কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। এদের অনেককেই বহুদিন এখানে থাকতে হয়েছে—তাই এদেশের মানুষের সঙ্গে তারা মিশেছে—অনেক ক্ষেত্রেই করেছে ঘনিষ্ঠতা। বহুস্থলে রীতিমত বন্ধুত্বও হয়েছে।

আমার বিদেশী বন্ধুটি কোনো বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, মেধাবী ও বুদ্ধিমান। এদেশের খবরাখবর রাখবার বিশেষ কোনো সুযোগ ওদের নেই—কারণ য়ুরোপের পদানত হল ভারত—তাই প্রভুশক্তির বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের স্কুল কলেজে পড়তে হয়, মুখস্থ করতে হয় এবং পরীক্ষা দিতে হয়। তাদের রোজ নামচা আমরা জানি—কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে দু চারটি প্রধান খবর ও ইতিহাসের গল্প ছাড়া ওদের বিশেষ কিছুই জানা নেই! তাই আমাদের দেশ সম্বন্ধে ওদের অজ্ঞতা অসীম—ওরা জানে ভারতবর্ষ এখনো বনে জঙ্গলে পূর্ণ—বাঘ ভাল্লুক চরে, মানুষ অর্ধনগ্ন হয়ে ঘোরে। আর নেহাৎ আমরা অতি ভাগ্যবান জাতি বলে আমাদের বিবেকানন্দ, টেগোর, বোস (জগদীশ) ও গান্ধীর নাম তারা শুনেছে! কিন্তু এঁদের নাম শুনলেও এঁদের প্রকৃত পরিচয়, ওদের শিক্ষিত সমাজের খবর রাখনেওয়ালারা ছাড়া জানে না। কাজেই যুদ্ধের ব্যাপারে এদেশে এসে তারা অনেক দেখেছে জেনেছে ও বুঝেছে যার ফলে তাদের অতীত দৃষ্টি ভংগী ও চিন্তাধারাকে আমূল বদলিয়ে

দিয়েছে। এ যুদ্ধে ভারত স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করে নি, হয়েছে প্রভুর ক্রীড়নক—ভারতবর্ষের তাই ক্ষতি হয়েছে অনেক, কিন্তু লাভের অঙ্কও কম নয়। দুই দেশবাসী পরস্পর মিলিত হয়েছে একই স্থানে—উভয়েই পেয়েছে এবং দিয়েছে।

আমার উল্লিখিত বন্ধুটি বিদ্বান এবং সাহিত্য রসিক। এ দেশ সম্বন্ধে বরাবর আগ্রহশীল। বিবেকানন্দ, টেগোর ও গান্ধীর সব অনূদিত বা ইংরেজীতে লেখা বই তাঁর পড়া। শরৎচন্দ্রের অনুবাদও তাঁর দৃষ্টির বাইরে যায় নি।

সাহিত্যের সমালোচনা প্রথম দিন উঠতেই তিনি বললেন, 'আচ্ছা, টেগোরের পর তোমাদের দেশে অন্য কোনো সাহিত্যিক বা কবির নাম ত শুনি নি। টেগোরের পরই যাঁর আসন এমন সাহিত্যিক নিশ্চয়ই তোমাদের আছেন? কে তিনি?'

আমি চুপ করে থাকি।

বন্ধুটি আবার প্রশ্ন করলো, 'তাঁর কি নাম?'

কার নাম করি রবীন্দ্রনাথের পরেই? (হায়! রবীন্দ্রনাথ যাবার সময়ে একটি সাহিত্যিক উত্তরাধিকারী রেখে গেলেন না, নইলে এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!) রবীন্দ্রনাথেরই যেন সব দোষ এই ভেবে তাঁর ওপর রাগ করতে গিয়ে হঠাৎ একটা নাম মাথায় খেলে গেল, গম্ভীরভাবে বললুম, 'তাঁর নাম নিবারণ চক্রবর্তী।'

'কি নাম বললে?'

'নিবারণ চক্রবর্তী।'

'টেগোরের পরেই এঁর স্থান?'

'হ্যাঁ, পরে কেন, টেগোরের সমান এঁর স্থান!'

বন্ধু দাঁড়িয়ে উঠলো, 'বল কি! এঁর নাম ত শুনি নি কখনো। এঁর কোনো বই অনূদিত হয়েছে নিশ্চয়ই?'

সেরেছে।

'উনি কি লেখেন। করিতা না গদ্য?'

'কবিতা।'

'কবিতা! টেগোরের সমান স্থান—অথচ আমরা নাম শুনি নি। বলছো কি তুমি! তুমি ঠাট্টা করছ না ত?'

'ঠাট্টা করবো কেন? ঠিকই বলছি। এঁর নাম কোত্থেকে শুনবে বল, টেগোর নিজেই তাকে চেপে দিলেন—বেচারার প্রতিভা অকালেই ঝরে গেল।'

'মারা গেছেন না কি?'

'মারা যান নি। মারা হয়েছে।'

'য়্যাঁ'—লম্বা হাঁ করে রইল বন্ধুটি, 'খুন না কি?'

'হ্যাঁ খুন। সে এক অতি বিয়োগান্ত নাট্য। খুনটা অবশ্য টেগোর করেন নি। টেগোরের ইচ্ছায় ও মৌন নির্দেশে লাবণ্যই তাকে খুন করলে।'

'লাবণ্য? সে কে?'

'সে এক নারী।'

'নারী? সে খুন করেছে?' বন্ধুটির আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে উঠছে! বললে, 'বল কি! এ যে দেখছি রীতিমত নাটক। ঘটনাটা কি বল ত!'

'ঘটনা আর কি।—নিবারণ চক্রবর্তী এক মস্ত বড় প্রতিভা ছিল—বয়সে তরুণ কিন্তু ক্ষমতায় ও প্রতিভায় টেগোরের সমকক্ষ। তার দু'টো কবিতা বেরোতেই টেগোর ঠাণ্ডা। বুঝলেন তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘোরানো চলবে না। এবার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তে হবে। সে ত যেখানে সেখানে টেগোরকে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াতে লাগলো। টেগোরের ঝুনো প্রতিভা যে আজ বার্ধক্যের রাহুগ্রস্ত এবং তাঁর এখন উচিত

বিদায় নেওয়া এই রকম সব কথা সভায় বলে চললো। টেগোর দেখলেন সমূহ বিপদ। এক নজরেই বুঝে নিলেন আজকের এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ অচিরেই আগুন হয়ে দেখা দেবে। তাঁর বুড়ো প্রতিভা দিয়ে তিনি ছোকরা প্রতিভাকে রোধ করতে পারবেন না। কিন্তু প্রতিভা বৃদ্ধ হলে কি হবে তাঁর বুদ্ধিটা বয়সের সঙ্গে বেশ পেকেছিল তাঁর সাদা দাড়ির মতোই, তায় তিনি প্রাচীন ভারতের লোক। দেবতাদের সনাতন পন্থা কাজে লাগালেন, পাঠালেন লাবণ্যকে। লাবণ্য হল শিক্ষিতা বিদুষী তরুণী, সুন্দরী না হলেও চটকেই নিবারণ চক্রবর্তীকে হাত করলো। তার মোহে ও প্রেমে পড়ে তরুণ কবি হাবুডুবু খেল, ভেসে গেল তার সব কবিতা, প্রতিভার দম্ভ। লাবণ্য ফাঁক পেলেই টেগোরের কবিতা শুনিয়ে দিত। তার মুখে টেগোরের কবিতা নিবারণের খারাপ লাগবার কথা নয়। কারণ টেগোরকে সে পছন্দ না করলেও লাবণ্যকে ভালবাসে। কিন্তু তার ভালবাসার ঘট উল্টিয়ে দিয়ে লাবণ্য তার এক পুরোনো প্রেমিককে বিয়ে করে একদিন সময় বুঝে সরে পড়লো। নিবারণ-চক্রবর্তী লাবণ্যকেও হারালো সেই সঙ্গে হারালো নিজের প্রতিভাকে। নিবারণ চক্রবর্তী মাথায় হাত দিয়ে বসলো, টেগোর দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসলেন, 'কেমন, এস এবার চ্যালেঞ্জ কর!'

'উঃ, কি ভয়ানক ট্রাজেডি। টেগোর এই রকম ভীষণ লোক!-যাক, নিবারণ চক্রবর্তীর তারপর কি হল?'

'হবে আর কি! এক ফেলে দেওয়া বান্ধবীকে বিয়ে করে সংসার পাতলো। তারপর কি হল জানি না।'

'সে খবরো রাখো না। এত বড় প্রতিভা! ও, তুমি বুঝি টেগোরের ভক্ত?'

'হ্যাঁ, অর্থাৎ নিবারণ চক্রবর্তীর বিরোধী দল !'

'খানিকক্ষণ চুপচাপ। আমি ততক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছি। খুব বাঁচা গেছে।

বন্ধুটি বললে, 'নিবারণ চক্রবর্তীর কোনো কবিতা জান? না তাও জানো না?'

'তা জানি বৈকি। প্রথম কবিতাটাই জানি। আবৃত্তি করে উঠি,

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
খোল দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।

গোটা কবিতাটি আবৃত্তির শেষে এর মানে বোঝাতে হল, শুনে বন্ধু বললে, 'অদ্ভুত! আশ্চর্য এই কবি-প্রতিভা! এঁর বই-এর নাম কি?'

'কোনো বই এর বেরোয় নি, এঁর কবিতা আছে টেগোরেরই বই-এর মধ্যে।'

'টেগোরের বই-এর মধ্যে?'

'হ্যাঁ, টেগোর তাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধেছিলেন কি না, পাছে ফসকে বেরিয়ে গিয়ে কাণ্ড বাধায়।'

'টেগোরের সে বই-এর নাম কি?'

অম্লান বদনে আমি বললুম, 'শেষের কবিতা'। এর ইংরেজি

অনুবাদ বেরিয়েছে। বইটা যোগাড় করে দেব পড়তে।'

কয়েক দিন পরে—

দেখা হতেই আমার পিঠে চাপড় মেরে বন্ধু বললে, 'দুষ্টু ছেলে। আমাকে বোকা বানানো হয়েছে! কিন্তু কি আশ্চর্য তোমাদের এই টেগোর! বইটা পড়া অবধি মন আমার অস্থির হয়ে উঠেছে। টেগোরের মতো এত বড় প্রতিভা পৃথিবীতে সত্যিই জন্মায় নি। 'শেষের কবিতা' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কি আইডিয়া! টেগোর নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেছেন, বলেছেন ছুটি নিতে। অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত!'

এক সঙ্গে বলে গেল বন্ধুটি। তারপর বলল, 'ও বইটি কিন্তু তুমি আর ফেরত পাচ্ছ না। ও সম্পদ আমি হাতে পেয়ে হারাতে পারবো না। নিয়ে যাব সঙ্গে করে। টেগোরকে যত বড় বলে বলে আমরা জানি তিনি যে তার চেয়েও কত বড়, আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনায় যে সে পরিমাপ হয় না তার নিদর্শন আমি দেখাব দেশের লোককে। তুমি আমায় বড় আনন্দ দিলে। তোমাদের দেশে এসে আমি সবচেয়ে বড় সম্পাদ পেলুম। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠস্বর আমার মনকেও ছুঁয়ে গেল। মরে মরে প্রণাম জানালুম সেই মহাপুরুষকে। আমাদের সব গেছে—সব হয় ত যাবে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবী কোনোদিন ভুলবে না—তাই ভুলতে পারবে না ভারতবর্ষকে। স্বাধীন বিদেশীর সামনে পরাধীন আমি ভারতবাসী—বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার জন্যে আমাদের আছেন মনীষীরা!

সামনেই চায়ের দোকান। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বন্ধু ঢুকলো সেখানে।

চা খেতে খেতে হঠাৎ বন্ধুটি বললে, 'হ্যাঁ, এবার বল তো সত্যি করে টেগোরের পর তোমাদের আশ্চর্য সাহিত্যে কার স্থান ?'

হায়রে ! কেমন করে বলব রবীন্দ্রনাথের পরে কার স্থান ?— রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য জগতের সূর্য, সে জগতে মিট মিটে একটি তারাও যে নেই !

গদ্যে শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী এবং কাব্যে সত্যেন দত্ত ও নজরুল রবীন্দ্রনাথেরই সমসাময়িক, বয়সে না হলেও সাহিত্য জগতে। শরৎচন্দ্র ও সত্যেন দত্ত রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন এবং প্রমথ চৌধুরী ও নজরুলের প্রতিভা ও দান রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকা কালেই চরম উৎকর্ষ লাভ করে যতিপাত ঘটায়, কাজেই রবীন্দ্রনাথের পরে বলতে এঁদের কাউকেই ধরা চলে না।

ছাদ

বাড়ীর মাথায় ছোট্ট একটি ছাদ মধ্যবিত্ত বাঙালীর শহুরে জীবনে যে কতখানি তা যাদের ছাদ আছে তারাই উপলব্ধি করবে। কোনো ভাষাতেই এর মূল্য বোঝানো যায় না।

আমরা বাঙালী পুরুষেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কুনো, বাইরে বেরোই নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদে। অন্ন সংস্থানের ঘাঁটি, আর রেশন কণ্ট্রোল আমাদের তীর্থ ক্ষেত্র! মেয়েরাও বাইরে বেরোয় না প্রায়! জীবনের দুর্বহ বোঝা বইবার জন্যে ভাঁড়ার রান্না আর সংসারের খুঁটি নাটি নিয়েই যাদের দিন কেটে যায়, তাদের বেড়াবার সময় কোথায়? তাদের বেরোন হয় ন'মাসে ছ'মাসে শুধু সিনেমা কি থিয়েটারে কিম্বা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে। বৃহত্তম পৃথিবীর কথা ভাববার তাদের সময় নেই, কোনো বিলাস নেই, অবসর যাপনের নেই সুবিধে। (প্রজাপতি-মেয়েদের কথা এখানে বলছি না, তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ) ছেলেপেলের চিন্তায়, চাল ডাল নুন তেল কয়লার ভাবনায় মাথার ওপর যে এমন আকাশ তার পানে চাইবার ফাঁকও নেই। অথচ আকাশে আকাশে যে এমন রং এমন সূর্য আর চাঁদের পরিক্রমা, আলো আর আঁধার, উষা ও গোধূলির খেলা, সে কি শহুরে বাঙালী মেয়েদের জীবনে বৃথাই যাবে? না, তা যেতে পারে না যদি মাথার ওপর ছোট এক টুকরো ছাদ থাকে। ছাদ নইলে বাঙালী মেয়ের চলে না।

এ্যারিয়েলের লম্বা বাঁশ দু'টো ছাদের দু'প্রান্তে আছে দাঁড়িয়ে, রেডিওর তার নেমে গেছে নীচের ঘরে (অবশ্য যাদের ঘরে রেডিও আছে) একদিকে রোদ্দুরে পাকিয়ে পাকিয়ে গুল দেওয়া হয়েছে। নানান ঋতুর পরিবর্তনে ছাদের রূপান্তর! কখনো লেপ তোষক, কখনো বড়ি-আচার কাসুন্দি আমসত্ত্ব, কখনো মাদুর পেতে শোওয়া। বারোমাস আড়াআড়ি বাঁশে বাঁধা দড়ি, তার ওপর ঝুলছে ধুতি শাড়ী সেমিজ জামা, সার্ট ব্লাউজ, কাঁথা ইজের। ছাদটা যদি বড় হয় ত ভালোই, না হলে ক্ষতি নেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাড়ীর পরিসর জায়গার অভাবে ছাদেই মনের আনন্দে লাফায়, দৌড়য়, নানা রকম খেলা তাদের। একটা কোণ বেছে নিয়ে জায়গাটাকে মাদুর খাড়া করে ঘেরাও করা হল, হল একটা ঘর, ছোট মেয়েরা পুতুল আর তার জামা কাপড় বিছানাপত্র, হাড়ি কুড়ি থালা বাসন নিয়ে পেতে বসলো পুরো এক সংসার! ছেলেরা অন্য এক কোণ থেকে নিয়ে আসে বাজার। রান্না হল, খাওয়া হল, কেউ আপিস গেল ছাদের অন্য কোণে। (হায়! আজকালকার ছেলেদের দেখি রাজা রাজা খেলার সখ নেই, চাকুরে বাবু সাজে!) মেয়েরা বসে পুতুল নিয়ে। তাকে নাওয়ানো কাপড় পরানো খাওয়ানো, শেষে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানো। মাঝে মাঝে খোকন মণির ঘুম না এলে আদো আদো গলায় 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ী যেও' কিম্বা 'আয় চাঁদ আয় খোকার চোখে ঘুম দিয়ে যায়'। সব ছাদের এক কোণ থেকে অপর কোণে খাড়া মাদুর ঘেরা ছোট্ট ঘরের আড়ালে। ঘুড়ির সময় ত রক্ষে নেই। আশ-পাশের যত ছাদ আছে, সব দেখ ভর্তি, ঘুড়ি ওড়ানো হচ্ছে আর ভোকাআটা শব্দে এ-ছাদ থেকে ও ছাদে জানান দেওয়া চলছে। একটু বয়স্ক মেয়েরা যারা হালফিল প্রেম করছে আড়ালে আবডালে, তারা যদি বাড়ীতে কোনো বন্ধুকে পেল ত স্বস্তি নেই। নিজের

প্রণয় কাহিনী বন্ধুকে শোনাবার জন্যে ছটফট করতে থাকে, কিন্তু বলবে কোথায়? হট্টগোল আর লোকের ভিড়ে বাড়ীর প্রতিটি অংশ ভরাট, নিয়ে এল বন্ধুকে ছাদে। নির্জনে একান্তে নিশ্চিন্ত মনে চাপা স্বরের মৃদু উত্তেজনায় আর লজ্জার ঈষৎ ভঙ্গিতে বন্ধুর সাথে চললো প্রণয়ের কথা। তাই নিয়ে হাসাহাসি, ঠোঁটের ও চোখের কোণে ঘন রহস্যময়তা ও সুন্দর সরসতার ঢেউ। ছাদ না থাকলে কি তা হত? প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর যেখানে নেই, এমন কি বেশীর ভাগ স্থলে যেখানে প্রয়োজনও মেটে না ঘরের অভাবে, সেখানে হাত পা মেলে বসবার জায়গাও নেই। ছাদেই তা সম্ভব। যে-টুকু আরাম, যে-টুকু স্বস্তি ও সান্ত্বনা, যে টুকু তৃপ্তি ও সুখের আশ্বাস, বুক ভরে নাও এই ছাদের খোলা হাওয়ায়। পৃথিবীকে দেখ মুক্ত আলোয়, বিরাট অসীম দিগন্তের দিকে অবাধ দৃষ্টিকে প্রসারিত কর। সুদূরের তাল সুপারি আর ঘন নারকেলের সারির কিম্বা অদূরের সুউচ্চ বাড়ীর ওপর দিয়ে দেখ—চোখ দু'টি যেন ছোটে সকল কিছুর ওপরে, সব কিছুই তার তাঁবে। বাধা নেই, নেই বিঘ্ন, নিঃশ্বাস নেবে প্রাণ ভরে, পরিষ্কার হাওয়ায় শরীরের রক্ত হবে শুদ্ধ, হবে তৃপ্ত। লম্বালম্বি পায়চারি কর, ব্যায়ামের কাজ হবে। কি মেয়ে কি পুরুষ কি আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই এখানে পাবে মুক্তির আস্বাদ। নীচের তলায় রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর হিসেবপত্র আর সংসারের শত সহস্র ঝংঝাট রেখে কিছুক্ষণের জন্যে উঠে এস ছাদে, মনে হবে ঐ বিরাট অসীমের কাছে কোথাও যেন এসেছি—নীচেকার বন্ধ ঘরে অন্ধকূপে জীবনের সব দায় নামিয়ে উঠে এসেছি এই ছাদে। কিছুক্ষণ বাদে আবার যখন নামবে নীচে—সংসারের আবর্তে, নামবে ওপরকার বিশুদ্ধ বাতাসে নেওয়া মুক্তির স্বাদে। পৃথিবীকে দেখবে ওপরের দেখা সেই দিগন্ত প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে। বাঁচতে ইচ্ছে হবে, আকাশের রংছটায় মনে রং ধরবে,

পৃথিবীকে ভালবাসতে ইচ্ছে হবে, জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে জোর পাবে। পৃথিবীর রূপ দেখেছ আকাশে আকাশে ছাওয়া আর স্তরে স্তরে বওয়া মুক্ত হাওয়ার প্রাঙ্গনে—বাঙালীর ঘূণ ধরা শতছিদ্রময় অপরিসর ক্ষণস্থায়ী জীবনের অঙ্গনে।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর শহুরে জীবনে ছাদ এক আশীর্বাদ;

জ গ ন্না থে র র থ

আমাদের আনন্দ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে !

শুনেছি এবং বই-এ পড়েছি আমাদের ঠাকুর্দাদের আমলে না কি বাঙালীর ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বন লেগে থাকতো। সারা বছর ধরে চলতো একটা না একটা উপলক্ষ্য করে আনন্দ উৎসব। সে সব অবশ্য চোখে দেখি নি। তারপর দেখেছি বারো মাসের তেরো পার্বন ক্রমশ কমতে কমতে মাত্র কয়েকটি পার্বনে এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে দুর্গোৎসবই সর্বপ্রধান। সারা বছর বাংলা দেশে শহর গ্রামের মানুষ আবাল বৃদ্ধ বণিতা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে থাকতো উন্মুখ হয়ে। একটি বছরের তিনশো চৌষট্টি দিনের উদয়াস্ত পরিশ্রম, দুঃখ বেদনা, অভাব অভিযোগ সব মুখ বুজে বাঙালী সহ্য করতো শরৎকালের কয়েকটি দিনকে স্মরণ করে। তার প্রতিক্ষায় থেকে। দুর্গোৎসবের আনন্দ ছিল সবার জন্যে।

আমাদের ছাত্র জীবনে অবশ্য আর একটি প্রধান উৎসব ছিল। সরস্বতী পূজো। সরস্বতী পূজোর দু'টি দিনের জন্যে আমাদের তরুণ জীবনে এমনি এক খুশীর ও আনন্দের ঢেউ জাগতো। মেতে উঠতাম নানা রঙে। এই উপলক্ষে চলতো আয়োজন গান বাজনার, থিয়েটারের। উৎসবের এক মাস আগে থেকে বগলে চাঁদার খাতা নিয়ে দল বেঁধে আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব—কত লোকেরই না জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছি !

আজো সরস্বতী পূজো হয়। আগের চেয়ে অনেক বেশী কিন্তু—।

কিন্তু, থাক এখন। পরে বলছি।

এই দু'টি প্রধান উৎসব ছাড়া সার্বজনীন আনন্দের অন্য কোনো উপলক্ষ সেদিন ছিল না। ছোটদের সময় কা'টতো পড়াশুনোয়, খেলায়, আড্ডায়। বড়দের অর্থোপার্জনের কঠিন ধান্দায়।

সেদিন রথের ও চড়কের দিনও ছিল গোনা গুণতি। একদিন করে তার আয়ু।

আজ দুর্গা পূজোর সংখ্যা যে অনুপাতে বেড়েছে, সেই পরিমাণে বেড়েছে অন্যান্য দেব দেবীর পূজো। আগেকার দিনে যে সব দেব দেবী বিশেষ পাত্তা পেতেন না, বা বিশেষ এক শ্রেণী বা সমাজের কাছেই পেতেন পূজো, তাঁরাও এই ডেমোক্রেসীর যুগে 'বারোয়ারী' হয়েছেন। যেখানে সাধারণ মানুষের জন্যেই সংবিধানে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতারাই বা কেন সে অধিকারে বঞ্চিত হবেন! অতএব এখন দুর্গা দেবী, কালী দেবী জগদ্ধাত্রী দেবীর সঙ্গে একাসনে বসছেন অনেক দেব দেবী—যাঁরা হয় ত দেব-রাজ্যেও একত্রে বসতে পারেন না! তাতে কি হয়েছে। ভারতবর্ষ ত আর দেব-রাজ্য নয়। রাম-রাজ্য! আর রাম-রাজ্যে প্রজাদের কি আরাম সে ত সবাই দেখছেন। আধুনিক রাম-রাজ্যে আরাম 'হারাম' হ্যায়, তাই সতেরো বছরে একটিও সমস্যার সমাধান ইচ্ছে করেই করা হয় নি। বরং নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভাবন করা হয়েছে যাতে তার সমাধান করতে করতেই একটা জীবন কেটে যায়! 'হারাম' কি হায় সেটা অবশ্য এখনো বলে দেন নি কেউ। আশা করি কোনো গান্ধী শিষ্য অথবা অন্য কোনো মহাত্মা-পুরুষ সেটা বলে দেবেন একদিন!

যাক যা বলছিলাম। দেব দেবীদের পূজো যেমন বেড়েছে,

পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায়, মাঠে ঘাটে যে পরিমাণে দেব দেবীর আবির্ভাব হচ্ছে—প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে যে উৎসবের ধুম বেড়েছে, দেব দেবীর বিসর্জনের যাত্রায় যে প্রচণ্ড শোকার্ত 'টুইস্ট' নাচের ব্যবস্থা হয়েছে—তাতে এ-কথা মনে করলে ভুল হবে না যে আগের চেয়ে আমাদের ধর্মে মতি বেড়েছে। আমরা অধিকতর মাত্রায় ধার্মিক হচ্ছি! তাই ত এত নাচন, এত কাঁদন। চোঙা প্যাণ্ট, রঙবেরঙের কুর্তা, পায়ে ছুঁচলো জুতো ও মাথায় কিষাণ-টুপী—এই সাজে সেজে আমরা শোকে অধীর হয়ে কি ভাবেই না আকুলি বিকুলি হচ্ছি!

মনে পড়ছে গত বছর দুর্গা পূজোর বিসর্জন-যাত্রা দেখতে বেরিয়েছিলাম আমার এক বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে—যিনি সদ্য এসেছিলেন বিদেশ থেকে এ-দেশে ভ্রমণে। কলকাতার মতো সুসভ্য শহরে দুর্গা দেবীর বিসর্জন যাত্রা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম তাঁর সঙ্গে। সেই শোভাযাত্রায় একদল ছেলেকে ঐ রকম সাজ সজ্জায় 'টুইস্ট' নাচতে দেখে আমার সঙ্গী বিদেশী বন্ধু বললেন, 'What is the significance?'

উত্তরে জানালাম, 'Significance কি হে! যাকে তোমাদের দেশে আজ 'টুইস্ট' নৃত্য বলছ সে যে আমাদের দেশে আদিম ও অকৃত্রিম এক প্রকার ভক্তিমূলক নৃত্য! দেবীর বিরহে শোক প্রকাশের এ যে আমাদের সনাতন অঙ্গভঙ্গি!'

কি আর বলতাম বন্ধুটিকে!

বন্ধুটি বললে, 'You are far too advanced than the Westerners.'

হেসে বললাম, 'You know, the Sun rises in the east and sets in the West!'

এবার রথের দিন দু'টি শোভাযাত্রা দেখলাম পরপর পথ দিয়ে

যেতে যেতে। প্রথম রথের আগমন ধ্বনি শুনতে পেলাম বহুদূর থেকে ভেসে আসা মিলিত কনসার্ট বিউগল্ ও 'জগন্নাথ মাঈ কি জয়ে'র আকাশ বিদারী চিৎকারে।

যাক, জগন্নাথ দেব তাহলে এবার 'দেবীত্বে' রূপান্তরিত হচ্ছেন! সুখবর সন্দেহ নেই! এমনিতেই দেবীদের সংখ্যাধিক্য এদেশে, ছু'একজন 'দেব' যাঁরা এখনো আমাদের কাছ থেকে 'চাল কলা' পাচ্ছেন—তাঁদেরও যে আমাদের হাতে পড়ে 'লিঙ্গ' পরিবর্তন হচ্ছে, সে খবর বোধহয় তাঁরা এখনো জানতে পারেন নি ত্রিকালজ্ঞ হয়েও!

দেখলাম শোভাযাত্রাটি এগিয়ে এল। প্রকাণ্ড রথ। জগন্নাথ দেবের (কি বলবো 'দেবী'?) সাজ সজ্জা জাঁকালো, রথ টানছে 'আওয়ারা ব্র্যাণ্ড' ছেলের দল। সেই নাচানাচি আর শোকের 'টুইস্ট' নাচ। আলোর বন্যায়, ব্যাণ্ডের দামামায়, চোখ কান ধাঁধিয়ে চলে গেল দলটি।

জগন্নাথ দেবের 'দেবীত্ব' প্রাপ্তির জন্যেই হোক বা রথবাহীদের পরাকাষ্ঠা দেখেই হোক আনন্দে আপ্লুত হয়ে এগিয়ে চললাম। অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম এক রাস্তার মোড়ে এসে! আর এক রথ যাত্রা। এ রথ ছোট, জগন্নাথের সাজ সজ্জা নেই, এক জায়গায় রথটি দাঁড় করানো রয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে ছু'টি লোক শঙ্খ বাজাচ্ছে। মুষ্টিমেয় লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে আশে পাশে। কেউ কেউ হাত বুলোচ্ছে রথের চাকায়, কেউ সামনের দড়ি একটু টান দিচ্ছে, কেউ প্রণাম করছে মাথা ঠেকিয়ে রথের ওপরে।

লোকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এরা আপনার আমার বাড়ীর ঠাকুর, চাকর, আপিসের বয় বেয়ারা, নীচু শ্রেণীর কর্মচারী। প্রত্যেকটি লোকের চোখে মুখের চেহারা ভক্তি মিশ্রিত। ভাব গম্ভীর পরিবেশ। কি নিষ্ঠা রথের চাকায় হাত বুলানোতে,

দড়িটা ধরাতে, প্রণামের ঋজু ভঙ্গিতে! দাঁড়িয়ে দেখলাম খানিকক্ষণ আর দেখলাম জগন্নাথ দেবের মুখখানি। পরিতৃপ্ত, হাসি মুখ। তাঁর এই মুষ্টিমেয় ভক্তদের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর যে আসন পাতা, সেই নিভৃত আসন থেকে যেন তিনি উঠে এসে বসেছেন তাঁর এই ভক্তদের খুশী করতে এই সাজ সজ্জাহীন আলোর দ্যুতিহীন রথে!

মনে পড়ে গেল একটু আগে দেখা রথের কথা। বহু মূল্যবান সাজ সজ্জা ভূষিত রথ আর আলোর শোভাযাত্রা। মনে প্রশ্ন জাগল জগন্নাথ আজ কার রথে চলেছেন?

কো কি লে র ডা ক

কোকিল আজো ডাকে।

কিন্তু কজন আছে এই সংসারে যারা কান পেতে সে ডাক শোনে! অথবা যদি বা অকস্মাৎ শুনে ফেলে ত, কিছুক্ষণের জন্যে বিস্মৃত হয় এই পৃথিবীর পারিপার্শ্বিককে!

না, তাদের সংখ্যা কমে গেছে। হয় ত এমন একদিন আসবে যেদিন কোকিল আর ডাকবে না।

সেই নিদারুণ দিনের কথা মনে হলে এখনই আমার হৃৎকম্প হয়। সেই ভয়ঙ্কর দিনে আসবেই হয় ত একদিন, সেদিন হে ঈশ্বর, আমি যেন বেঁচে না থাকি।

আমাকে আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভাবালু মনে করছেন। কবি প্রকৃতি হাল্কা চটুল স্বভাবের মানুষ বলে ধরে নিচ্ছেন! এ-যুগে, এই প্রচণ্ড যান্ত্রিক যুগে, লৌ-দানবের ঘূর্ণিচক্রে যে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে, সেই পৃথিবীর মানুষ কি না পাখীর ডাকে বিহ্বল! কান পেতে চায় শুনতে তার ডাক! এমন মানুষের জন্যে নয় আজকের পৃথিবী। অতীত দিনের ফসিল তেমন মানুষ। শিলীভূত তার তার মন!

তাই হবে হয় ত। আর ত কারো কাছে শুনি না কোকিলের-কথা। আর ত শুনি না আমার মতন চঞ্চল হয় তার মন কোকিলের ডাক শুনে!

জানি, এই বিংশ শতাব্দীতে এই ধরণের দুর্বলতা অমার্জনীয়।

ঘরে বাইরে নিন্দনীয়। মানুষ মরছে বোমায় ক্ষুধার তাড়নায়। পথে প্রান্তরে আশ্রয়হারা ছন্নছাড়ার দল। ভিক্ষার ঝুলি সম্বল। দারুণ শীতে দিগম্বর, গায়ে নেই কম্বল। পথে বসতি।

কেন ?

কার পাপে কার দোষে আজ এক শ্রেণীর মানুষ দিশেহারা, পথাশ্রয়ী ? কি অপরাধ তাদের ? কে তাদের ঘর ভেঙেছে ? অথবা কারা তাদের সুখ স্বর্গ শান্তি নীড় প্রচণ্ড আঘাতে টুকরো টুকরো করেছে ?

বলতে পারেন ?

না, পারেন না। পারবেন না। কারণ আপনি নিজেকে ভালবেসেছেন, আমি ভালবেসেছি নিজেকে। আর আপনি আমি নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ ঘরটুকুকে করেছি সার। তাই তাকাই না পাশের মানুষটির দিকে। যে মানুষটি পথ দিয়ে চলেছে হেঁটে ক্লান্ত পায়ে, আমি মোটরের দ্রুত শক্তিতে তাকে পেছনে ফেলে যাচ্ছি না শুধু—যাচ্ছি তাকে মাড়িয়ে। দলিত মথিত করে যাচ্ছি তাকে। কারণ আমি গাড়ীর আরোহী। চারটে চাকা নীচে ঘুরছে, আমার হাতে ঘুরছে একটি চাকা—আর যে টাকায় এই গাড়ীটা কেনা—সেটার আকারও ত চাকার মতো। চাকায় চাকায় ঘুরছে চক্রাকারে এই জীবন। আপনার, আমার। তাই অন্য জীবন পড়ে না নজরে। একটি পথচারীকে এইমাত্র চাপা দিয়ে যে গাড়ীটা দ্রুত বেরিয়ে গেল—রাখল কি হিসেব সেই আরোহী পথচারীর—তার ঘরের, তার সঙ্গে জড়িত কয়েকটি জীবনের !

আপনার আমার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আছে পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক—যারা চায় পররাজ্য গ্রাস করতে। নিজের রাজ্য নিয়ে যারা সন্তুষ্ট নয়। খুশী নয় নিজের গণ্ডীতে। তাই লোলুপ

দৃষ্টি পাশের রাজ্যের ওপর। ওরা লোলুপতাকে বলে রাজনীতি। সেই রাজনীতির তাগিদে আসে অস্ত্রশস্ত্র, আসে গোলাবারুদ, আসে বোমা, এ্যটম বোমা। মারণাস্ত্র যত সব। আর বলে আত্মরক্ষার্থেই না কি সে সব অস্ত্রের ব্যবহার! পররাজ্য গ্রাস সেই আত্মরক্ষার তাগিদেই!

বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে যারা বনে বনে চার পায়ে ঘুরে বেড়ায় সেই নখ দাঁত শিং ওয়ালা জীব, তাদের আমরা বলি পশু। তাদের ধরে এনে সভ্য শহরে লোহার বেড়ির মধ্যে রেখে সকলকে দেখাবার ব্যবস্থা করি। লাঠি দিয়ে খোঁচাই। সহবৎ শেখাই, সার্কাসের খেলা দেখাবার জন্যে শিক্ষা দিই তাদের নানা প্রক্রিয়ায়।

আপনার আমার শিং নেই। চার পায়ে হাঁটি না আমরা। আমাদের নখ আমরা নিয়মিত কেটে ছোট করি, দাঁত সুগন্ধী টুথ পেষ্টে ব্রাশ দিয়ে মেজে ঝক্ঝকে করে রাখি। চুল সুন্দর করে ছাঁটি। মন মাতানো তেল দিই মাথায়। তেড়ি কাটি।

আমাদের দেহের ওপর নানা ধরণের পোষাক চাপিয়ে দু'পায়ে ঘোরাফেরা করি। সভ্যতার কথা বলি। বরফ যুগ, প্রস্তর যুগ লৌহ যুগ, অগ্নি যুগ—কত যুগ যুগান্তর পেরিয়ে এই মানব-সভ্যতা!

তাই কত সহজেই না আমরা পারি মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান না করতে! মানুষ হয়ে মানুষকে তার যথার্থ মূল্য না দিতে! কত অনায়াসেই না রাজনীতির জন্যে আমরা কেড়ে নিই পররাজ্য, ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে দিই সেই রাজ্যের মানুষের ঘর দোর। চুরমার করে দিই তাদের স্বপ্ন ও সাধনাকে। কত সহজে! কত অনায়াশে!

তাই ত আজ কেউ যদি আর কোকিলের ডাক শুনতে না পায় অথবা শুনেও বিহ্বল না হয় তার মন, ত সে দোষ কার!

ল জ্জা র ক থা

লজ্জার কথা বলতে বসেছি বলে ধরে নেবেন না যে আমার দু'কানই কাটা। লজ্জা বস্তুটি আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মতো আমারো আছে। ভদ্রলোকের মতো বললাম এই জন্যে যে লজ্জা সভ্যতার এক অভিব্যক্তি। ভদ্রতারও বটে। এই দেখুন না সেই আদিম যুগের কথা ভেবে। আমরা যাদের বর্বর বলি—সেই নগ্ন মানুষের দল, যারা অরণ্যে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো, হাতে নানা অস্ত্র নিয়ে যারা জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে নিত্য লড়াই করে জীবন ধারণ করতো —তাদের লজ্জা ছিলো না। কিন্তু আমরা সভ্য জগতের মানুষ, সভ্যতা আমাদের অনেক কিছুর সঙ্গে দিয়েছে লজ্জার শিক্ষা। তাই আমাদের পোষাকে ব্যবহারে লজ্জার নানা প্রকাশ। স্থান কাল জাতি ভেদে লজ্জার নানা ধরণের ব্যঞ্জনা। সেই অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার রীতি নীতি দেশে দেশে ভিন্ন।

যেমন ধরুন য়ুরোপের শ্বেতাঙ্গিনীরা কাঁধ থেকে হাঁটুর নীচ অবধি পরে গাউন, নয় ব্লাউজ ও স্কার্ট। তাদের বক্ষোদেশ নির্ভিক সৈনিকের মতো স্পষ্ট, আবরণহীন। বক্ষকে এ ভাবে প্রকাশমান রাখায় য়ুরোপীয় মেয়ের লজ্জা নেই। কিন্তু আমাদের প্রাচ্যদেশীয় মেয়েদের সেইটেই সবচেয়ে লজ্জার বস্তু। শাড়ী পরলে ত কথাই নেই, ঘাঘরা পরলেও কাঁচুলীর ওপর ওড়না বুকের ঔদ্ধত্যকে দাবিয়ে রাখে। একমাত্র মেয়েদের বক্ষাবরণের ওপরই লজ্জার নানা অভিব্যক্তি ও আভরণ জাতি ও দেশ অনুসারে। প্রাচ্যের মেয়েরা

পায়ের নখ অবধি ঢেকে রাখে শাড়ী ঘাঘরার আস্তরণে ; য়ুরোপীয় মেয়েদের হাঁটুর নীচ অবধি লজ্জার সীমা, পা দু'টি তারা খোলা রাখতেই ভালোবাসে। মোজা পরে নাইলনের, তার স্বচ্ছতা ভেদ করে দেখা যায় শ্বেতাঙ্গিনীর পা দু'টির সৌন্দর্য (অথবা কদর্যতা)। প্রাচ্যের মেয়েরা মাথায় দেয় ওড়না, নয় ঘোমটা। য়ুরোপীয় মেয়েদের এ-সব বালাই নেই। কেউ কেউ অবশ্য সখ করে শীতকালে স্কার্ফ দেয় মাথায়। শুধু মেয়েদের বেলাতেই নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও লজ্জার বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশ জাতি ও দেশগতভাবে। য়ুরোপে পুরুষদের খালি পা দেখলে ওখানকার মেয়েরা শক্‌ড হন। গলা থেকে পা অবধি কোথাও ফাঁক নেই পুরুষের পোষাকে। এ দেশে পুরুষদের হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরতে কোনো লজ্জা নেই। এতে মনে হতে পারে য়ুরোপের মেয়েদের লজ্জাবোধ কম, পুরুষের বেশী, এ দেশে তার বিপরীত। কিন্তু য়ুরোপের মেয়েরা ও এ দেশের পুরুষেরা নির্লজ্জ এ-কথা কেউ বলবে ? এ দিকে আবার সাধারণ অবস্থায় য়ুরোপে পুরুষেরা পোষাকে মোড়া থাকে, সমুদ্রতীরে স্নানের সময় তেমনি তারা তাদের মোড়ক খুলে ফেলে। মাত্র ছোট একটি আঁটো পাজামা প'রে স্ত্রী বা বান্ধবীর সঙ্গে ঘাটে ঘাটে ঐ অবস্থায় ঘুরে রেড়ায়। সঙ্গিনীর অঙ্গেও থাকে নামমাত্র আবরণ। দু'পিস বিকিনি স্যুট, অর্থাৎ বক্ষ ও কটিতটটুকুই আবরিত। একই দেশে আবহাওয়ার পরিবর্তনে পোষাকের পরিবর্তন, লজ্জার অভিব্যক্তির হয় রূপান্তর।

এই পৃথিবীর নানা অংশে একই সময়ে লজ্জার মাত্রাবোধ ও সীমারেখাও বৈচিত্র্যময়। অনগ্রসর বন্য জাতির মেয়েদের কটিতট ছাড়া সর্বাঙ্গই প্রায় নগ্ন ; হয় তো বুকের ওপর একরাশ চিত্রবিচিত্র গয়না বক্ষাবরণের কাজ করে। কোথাও তাও নেই, আছে শুধু একটি ক্ষীণ কটিবেষ্টনী।

এ তো গেল পোষাক পরিচ্ছদের কথা। আচার ব্যবহার রীতি নীতিরই কি কম পার্থক্য? য়ুরোপীয় বৌরা শ্বশুর শাশুড়ীকে লজ্জা করে না, তাদের সামনেই স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে চুমু খেতে বাধা নেই। শ্বশুর শাশুড়ীরও বাধে না ছেলে বৌএর সামনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে। একঘর লোকের সামনে কি জনবহুল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে স্বামী স্ত্রী বা প্রেমিক প্রেমিকার আগমন ও বিদায় চুম্বনে কোনো নির্লজ্জতা নেই।

ও দেশে শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে ছেলে বৌএর আলিঙ্গন অশোভন নয়। কিন্তু এ দেশে শ্বশুর শাশুড়ীর বা অন্য কোন লোকের সামনে স্বামী স্ত্রীর আলিঙ্গন করা তো দূরের কথা, ভালোবাসার কথা বলাও কেউ সুস্থ মাথায় কল্পনা করতে পারে না। এমন অনেক পরিবার আজো আছে যেখানে দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর দেখা হওয়া বা কথা বলাকে ভালো চোখে দেখে না। য়ুরোপে ভাসুর ভাদ্দর বৌএর সম্পর্ক শুধু আইনগত, লজ্জাসুলভ নয় এ দেশের মতো।

লজ্জা সভ্য সমাজের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ও রক্ষক। লজ্জা না থাকলে আজ আমাদের সভ্যতার গর্ব ধুলোয় লুটাতো। সবাই থাকতাম উলঙ্গ হয়ে। আর নয় ত পোষাক পরিচ্ছদের আবরণে থাকলেও মনে থাকত না দ্বিধা সংকোচ। এমন অনেক কাজ অহরহ করতাম যার ফলে সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হতো, এমন কি নিজের অস্তিত্বও। পথে ঘাটে ঘটতো নানান অঘটন, যা সভ্যতা বহির্ভূত। স্বামী স্ত্রী প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক, যে অনির্বচনীয় সুষমা, তা নষ্ট হতো লজ্জার অভাবে।

গোপনীয়তা লজ্জার দোসর। গোপনীয়তা থেকে লজ্জার উৎপত্তি না লজ্জা থেকে গোপনীয়তার উদ্ভব—এ প্রশ্ন থাক। এটাই স্বভাবত ধরা হয় যা গোপনীয় তাই লজ্জার, যা লজ্জার

তাই গোপনীয়। এ অনুজ্ঞা আন্তর্জাতিক। যে ঘটনা সর্ব সময়ে সর্ব সাধারণের সামনে ঘটছে তা গোপনীয়ও নয় লজ্জারও নয়। যেগুলি এ ভারে ঘটে না সেগুলি সাধারণভাবেই গোপনীয় ও লজ্জার। শিশুকাল থেকে লজ্জা ও গোপনীয়তা সম্বন্ধে মোটামুটি এই ধারণাই আমরা গড়ে তুলি।

আমাদের মনের কামনা বাসনার শেষ নেই। যত অশোভনই হোক, হোক যতই অসঙ্গত, মনের মধ্যে উদ্দাম হয়ে ওঠে তারা। বাইরে সেই উদ্দামতার প্রকাশ রুদ্ধ, নয় ত সীমাবদ্ধ। লজ্জাই সে উদ্দাম স্রোতকে দাবিয়ে রাখে, সংহত সংযত করে, রুচি সম্মত করে প্রকাশ করে। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কখনো অপ্রস্তুত করে না অপরের সামনে পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে। মেয়ে পুরুষের সম্বন্ধ যতই জৈবিক হোক, যতই হোক স্বাভাবিক—সে স্বভাবকে অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী বশ করতে শিখেছে মানুষ। স্বভাবকে বশ করার এই শিক্ষা ত মানুষ পেয়েছে সলজ্জ সংস্কারের প্রভাবেই! যেখানে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি রাশ মানে না, বিপর্যয় ঘটায় সমাজ-জীবনে, সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার সজাগ প্রহরী থাবা মেরে সে রাশ টেনে ধরে। এই যে আইন ও শৃঙ্খলার সীমারেখা ও মাত্রাবোধ—এ ত লজ্জারই দান!

দৈহিক অসংগতি ঢাকতে লজ্জা এসে সাহায্য করে। কত পুরুষ কত মেয়ের দেহে আছে কত অস্বাভাবিকতা, ত্রুটি বা অভাব। লজ্জা না থাকলে আর তার ফলে পোষাক পরিচ্ছদের উদ্ভব না হলে সেই সব মেয়ে পুরুষের দুর্দশার কথা একবার ভাবুন ত? প্রকাশ্যে চলাফেরা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো না কি?

নারী দেহের সৌন্দর্য পৃথিবীর একটি চিরন্তন সত্য। কিন্তু এই তন্বীদেহ ছড়িয়ে যে সৌন্দর্যের যাদু-স্পর্শ মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি মানব মনকে স্পর্শকাতর করে তুলবার ক্ষমতা

রাখে—এ কথা কি কেউ কল্পনা করেছে যতদিন নারী দেহে কোনো আবরণ ছিল না ? পুরুষের দৃষ্টি নারী দেহের প্রতি এর আগে আকৃষ্ট হয়েছে জৈবিক কারণে, প্রাকৃতিক নিয়মে, কিন্তু সে দেহে সৌন্দর্যের আবিষ্কার পুরুষ সেদিনই করেছে যেদিন সে দেখেছে নারী দেহ অংশে অংশে ঢাকা পড়ছে আবরণে। লজ্জার আবরণে সুকুমার তনুর রহস্য ঘন রোমাঞ্চ সেই দিন থেকেই পুরুষের মনকে মাতিয়ে তুললো। আর চোখে লাগলো ঘোর, অন্তরে জাগলো গভীর ক্ষুধা, কামনা বহ্নি সেই থেকে জ্বললো পুরুষের হৃদয়ে সে তনুকে ঘিরে। নারী দেহ প্রকৃতির অন্যতম আশ্চর্য সৌন্দর্য রূপে পুরুষের কাছে স্বীকৃত, গৃহীত ও বন্দিত হলো সেই থেকে।

যা খোলা, যা নিতান্তই প্রকাশমান, দিনের আলোর মতই স্পষ্ট, তার প্রতি মোহ জাগে না মানুষের মনে। যা নিজেই স্পষ্ট, জ্ঞেয়তার জন্যে মানুষের কখনো নেই মাথা ব্যথা। অস্পষ্টতা, দুর্জ্ঞেয়তার প্রতি তার তত আকর্ষণ, কল্পনার জাল বোনা, বাসনার অনুরণন!

বিশ্ববিখ্যাত যৌন তত্ত্ববিদ হ্যাভলক এলিস লজ্জা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন এবং যে বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করেছেন এই প্রসঙ্গে তাতেও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে লজ্জার দানের কথা স্বীকার করতেই হয়। ঘটনাটি হলো এই: প্যারিসের এক স্নানাগারে এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন স্নান করতে। একটি রূপসী মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থাতেই তাঁর স্নানের ব্যবস্থা করে। মেয়েটি কিন্তু তাঁর মনে কোনো চাঞ্চল্য আনতে পারে নি। এর কারণ খুঁজে দেখা গেল যে মেয়েটির আকর্ষণীয় সব কিছু পুরো মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও তার ছিল না স্বাভাবিক লজ্জা। এলিস বলেছেন modesty আমাদের ভেতর থেকে এলেও এবং আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও অন্যের ওপর এর রীতিমত প্রভাব আছে।

ঠিক এই রকম আর একটি ঘটনা দেখেছি প্যারিসেই।

সেখানকার বিশ্ববিখ্যাত 'ফলি বরজয়' নাচ গান হল্লার একটি অনুষ্ঠান। ষ্টেজের ওপর প্রায় বিবস্ত্র রূপসীরা আসর জমিয়ে তোলে। যেটুকু আবরণ তাদের থাকে সেটুকু না থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিলো না, শুধু আইনের জন্যেই সেটুকুর অস্তিত্ব। একটি দু'টি নয়, অসংখ্য এই রকম রূপসী ফিরছে নাচছে গান গাইছে। রসিকতা করছে দর্শকদের সঙ্গে। দর্শকরা উপভোগ করছে খুব। উন্মত্ত হয়ে উঠছে না তাদের দেখে। এমন কি চোখ মুখ দেখে এ কথা বোঝা যাচ্ছে না যে ঐ রূপসীরা তাদের নগ্নতার জন্যে বিশেষ দাগ কাটতে পেরেছে পুরুষ দর্শকদের মনে। তাদের দেহে যত সৌন্দর্যই থাক তাদের নির্লজ্জতায় সে সৌন্দর্য কোনো মোহ বিস্তার করে না দর্শকদের মনে।

আবার বেশী লজ্জাকে অনেকে অন্যায় ও ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে লজ্জা আমাদের অনেক অন্যায়, অজ্ঞতা ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। চাপা দেয় বহু জঘন্য অপরাধের। কথাটা ফেলে দেবার মতো নয়। লজ্জার জন্যে প্রকাশ্যে যে কাজ করা সম্ভব হয় না, গোপনতার আশ্রয়ে সেগুলি অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘরে বাইরে ঘূণ ধরে।

লজ্জা অনেক সময়ে আমাদের সহজ হতে দেয় না, আন্তরিকতার পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকতাকে করে নষ্ট। মানুষের সহজ সম্বন্ধ গড়ে ওঠার পথে প্রাথমিক বাধা লজ্জা। মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না লজ্জার জন্যেই। মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কত না বলা কথা—যে কথা বলা হলে কোনো একজন বিশেষ মানুষের কানে তা সংগীত হয়ে উঠতে পারতো। ঝংকার উঠতো তার হৃদয়-তন্ত্রীতে—সে কথা কোন দিনই পথ পায় না প্রকাশের। 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এই অত্যন্ত সহজ সজীব কথাটি কত মেয়ে বলতে পারে না তার প্রিয়কে কোনদিনও।

সে কথা নিজ মুখে বলে নির্লজ্জতা প্রকাশ করার চেয়ে বরণ করে নেয় অন্য এক জীবনকে। প্রিয়বরকে পায় না বররূপে, ঘর বাঁধতে হয় অপরের সঙ্গে। ব্যর্থতায় ভরে ওঠে কত জীবন এই লজ্জার হাত থেকে মুক্ত হতে না পারার দরুণ। নব-বধূর সাজে নতুন মানুষের হাত ধরে অজানার পথে যখন পা বাড়াচ্ছে সে নিঃসীম শূণ্যতা নিয়ে, তখন পথের পাশে তার প্রিয় রিক্ত মনে দাঁড়িয়ে থেকে নব বধূর চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে বারবার শুধু এই অনুযোগই করেঃ বলতে পারলে না তুমি তোমার বাবাকে মাকে? বলতে পারলে না যে তুমি আমাকে ভালবাসো? আমাকে ছাড়া তোমার জীবন ব্যর্থ? লজ্জাটাই তোমার কাছে সবচেয়ে বড় হলো? হৃদয়টা নয়, গোটা মানুষটা নয়!

দূ র নী তি !

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি।"

পাশের বাড়ীর স্কুল পড়ুয়া ছেলেটি এক নাগাড়ে চীৎকার করে কবিতাটি মুখস্থ করছে অনেকক্ষণ ধরে। তার কাছেই তার বাবা বসে সিগারেট খাচ্ছেন ও খবরের কাগজ পড়ছেন।

তিনতলা বাড়ীর দোতলায় ফ্ল্যাট। তিনখানা ঘর জুড়ে ন'জনের সংসার ভদ্রলোকের। বিধবা বৃদ্ধা মা, প্রৌঢ়া স্ত্রী; একজন হাঁপানী রুগী, অন্যজন বাতে পঙ্গু। তিন ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলে অনেকদিন বাড়ী ছাড়া, বোম্বাই না কোথায় প্রবাসী। মেজটি রাজনীতি করে, ছোটটি পড়ে স্কুলে। বড় মেয়ে এক সদাগরী অফিসের টাইপিস্ট, মেজ মেয়ে সরকারী আপিসের কেরাণী। আর ছোট মেয়ে পুতুল খেলে আর বৃদ্ধা ঠাকুমাকে পূজোর যোগান দেয়।

ভদ্রলোক নিজে একটি আপিসের বড়বাবু। মাইনে দু'শো পঁচাত্তর টাকা; বড় মেয়ের মাইনে একশ দশ, মেজ'র উপার্জনও প্রায় তাই।

ভদ্রলোক যদিও গলাবন্ধ কোট ও ধুতি পরেন; স্ত্রীর গায়ে গহনা প্রচুর। একই শাড়ী ব্লাউজ পরে রোজ আপিস করে না মেয়েরা। নিত্য নতুন পোষাক!

ফ্ল্যাটের ভাড়া তিনশ টাকা। পরিবারের সব শুদ্ধ চারশ

পঁচানব্বই টাকা আয়ে তিনশ টাকা শুধু ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে, ন'টি প্রাণীর চারবেলার অন্ন আর কাপড় জামা লোক লৌকিকতা সামাজিকতা সব বজায় রেখে কেমন করে ঐ আয়ে নিখুঁৎভাবে চলে—এটা বুঝতে পারেন না আমাদের পাড়ার অঙ্কের অধ্যাপক! তাঁর হিসাবে জমা ও খরচের কোনো সঙ্গতি পান না খুঁজে—মেলে না তাঁর অঙ্ক!

আমি তাঁকে বলেছি অনেক বার—সবই যে আপনার অঙ্ক-বিজ্ঞানে মিলবে তার কি মানে আছে! আর্ট বলেও ত একটা বস্তু আছে জগতে! তিনি সে-কথা মানতে চান না!

তাঁকে কি করে বোঝাই বলুন ত?

সাহিত্য সভা বসেছে ; অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপস্থিত আছেন। সভাপতি অবশ্য সাহিত্যিক নন, প্রধান অতিথিও অসাহিত্যিক। তাতে কি! সাধুদের সমাবেশে পৌরহিত্য যে একজন সাধুকেই করতে হবে, এমন কথা কে বললে! চোর ছ্যাঁচড়দের সভায় সভাপতি যিনি হবেন তিনি যে মার্কামারা চারশবিশ হবেন, তার কি মানে আছে!

অতএব আমাদের আজকের সাহিত্য সভার সভাপতি এবং প্রধান অতিথি দু'জনেই সাহিত্যিক নন বটে, তবে সাহিত্য সভায় যখন এসেছেন, তখন তাঁদের সাহিত্য রসিক বলতে বাধা নেই। আর সাহিত্য রসিক কে নয়! অবিসম্বাদিত রূপে পাঠক মাত্রেই সাহিত্য রসিক, আর বই-এর পাঠক হবার জন্যে একমাত্র যোগ্যতা হল অক্ষর জ্ঞান। কাজেই আমাদের সভাপতি এবং প্রধান অতিথি দু'জনেই অনেক না হোক কিছু বই ত পড়েছেন নিশ্চয়ই। সাহিত্য সভায় যোগদান করার পক্ষে সেটাই মস্ত বড় যোগ্যতা।

অবশ্য তাঁদের সে ভাবে যোগ্য মনে করে এই সাহিত্য যজ্ঞে ডাকা হয় নি। তাঁদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ক্ষমতাবান, অপরজন অর্থবান।

যার্ক সে সব কথা। সভাপতি মহাশয় সদাশয় ব্যক্তি। নধর কান্তি ; ভুঁড়িটা একটু বাড়ন্ত (চাল বাড়ন্ত অর্থে নয়, খাঁটি আভিধানিক অর্থে যাহা বাড়িতেছে তাহাই বাড়ন্ত—সেই অর্থে)।

শ্বেতশুভ্র পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধুতি পরে তিনি সভারূঢ়। নিমিলিত নয়নে দেখছেন পাশের 'একজন সাহিত্যিককে—তিনি দিচ্ছেন তাঁর ভাষণ। এমন সময়ে হঠাৎ ভাষণদাতার নজর পড়ল সভাপতি মহাশয়ের পিঠের দিকে, দেখলেন সেখানে একটি পাপিষ্ঠ ছারপোকা চলে বেড়াচ্ছে। ব্যস, ভাষণ থামিয়ে তিনি এক লাফে এসে সভাপতি মহাশয়ের পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বেয়াদপ ছারপোকাকে উৎখাত করলেন তিনি মুহূর্তের মধ্যে।

আর একজন সাহিত্যিকও দেখেছিলেন নৃশংস ছারপোকাকে সভাপতি মহাশয়ের পৃষ্ঠারোহণে। তিনি তাঁর নিজস্ব ভুঁড়ি সামলিয়ে সভাপতি মহাশয়ের ভুঁড়ি সমীপে আসার আগেই ভাষণরত সাহিত্যিক কাজ শেষ করে বিজয় গর্বে ফিরে গেছেন স্বস্থানে আবার থেমে যাওয়া ভাষণ জোড়া লাগাতে। দ্বিতীয় সাহিত্যিক বিরস বদনে মাঝপথে সরে গিয়ে বসলেন এবার সভাপতি মহাশয়ের কাছেই। হয় ত ভাবলেন, আহা, আবার যদি আসে কোনো রক্তচোষা ছারপোকা, কিম্বা একটি আরশুলা অথবা নিদেন পক্ষে একটি পিঁপড়ে; তবে তিনি এবার দেখাবেন হাতের খেলা।

এই ঘটনাটা আমার শোনা। চোখে দেখলে কি করতাম জানি না। শুনে অবধি ভাবছি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বহুৎ সমুজ্জ্বল। অতীতে বাঙালী সাহিত্যিকরা যে না খেয়ে মরেছে, মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে সেদিনকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবধি—তারা মরবে না ত কে মরবে! বাঁচতে তারা জানলো কবে! বাঁচার মতো করে বাঁচতে পেরেছে কি তারা? মিথ্যে অভিমান আর দম্ভ, সৃষ্টির আনন্দ ও নির্লোভিতার ফল কি হল? বাধ্যতামূলক অনশন, দারিদ্র্য, রোগ-জীর্ণতা—মৃত্যুকে আনলো ত্বরান্বিত করে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য ছিল আগেকার

সাহিত্যিকদের। কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা কপালে ছিল না তাদের আমলে। না পেতো প্রকাশকদের কাছ থেকে অর্থ, না পেতো রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় সম্মান। না খেয়ে সাহিত্য করতো কিসের আশায়? বাঙালী ত বই কেনে না। বাঙালীর অনেক বদ স্বভাব আছে, কিন্তু নেই অযথা বই কেনার বদ্ স্বভাব। খুব বেঁচে গেছে বাঙালীরা এই বিশ্রী স্বভাবের হাত থেকে। নইলে যা রুজি রোজগার, তার প্রায় সবটাই যায় সংসারে, সামান্য যা থাকে, সেটা যায় সিনেমা থিয়েটারে। কালচার বলে ত একটা বস্তু আছে সংসারে। আর যত কালচার ত সিনেমা থিয়েটারেই! এ ছাড়া লোক লৌকিকতা, সামাজিকতা, শীতের সময় নাচগানের জলসা, ক্রিকেট, সার্কাস—এ সব ত আছেই। বিশেষ করে আজকাল যদি কেউ বলে সিনেমা দেখি না বা ক্রিকেট খেলা দেখি না —তাহলে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যতম জীব বলেই ধরে নেওয়া হয় বিশেষ করে ক্রিকেট। ও সব খেলা বোঝ আর না বোঝ—যতগুলি খেলা ইডেন উদ্যানে হবে সব ক'টি দেখা চাই-ই। দশটা বাজতে না বাজতে, সাজ গোজ করে মাঠে হাজির হওয়া ও লাঞ্চের সময়ে লাঞ্চ, টি টাইমে টি—সেই সঙ্গে সমাগত পরিচিত জনদের কাছে তোমার মুখখানি দেখিয়ে না আনলে তুমি সভ্য কেতাদুরস্ত লোকই নও। শিক্ষিত বলেই ধরবে না তোমাকে তোমার বন্ধু বান্ধবীর দল যদি না দেখে তোমায় ইডেন উদ্যানে ক্রিকেটের মরশুমে।

টিকিট নিয়ে সেখানে যা ফটকাবাজি চলে, তার কাছে হার মানে স্টক এক্সচেঞ্জ! তার ওপর আবার এদিক ওদিক হলে খেলার মাঠ ঠেঙাঠেঙির মাঠে পরিণত হতেও সময় লাগে না বেশী! রেফারি বেচারারা ত মাঠে খেলাতে আসার আগে গীর্জা, কালী বাড়ী বা দরগায় মানত করে আসে পিতৃদত্ত প্রাণটুকু খেলার শেষে ঘরে

ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে!

যাক বলছিলাম কালচারের কথা। এই এত রকমের কালচার করার পর আর লোকের সময়, অর্থ ও ধৈর্য থাকে না বই পড়ার। কাজেই বাংলা দেশে বই-এর পাঠকের চেয়ে লেখকের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে বেশী। আর লেখাটাও এতই সহজ হয়ে গেছে আজকাল যে, যে কোনো লোক কলম ধরে কিছু 'আঁকি জুকি' করে পত্রিকায় প্রকাশ করলেই লেখক। লেখার চেয়ে সোজা জিনিস আর বাংলা দেশে কিছু নেই। যা হয় একটা কিছু লিখলেই হল। বিষয় বস্তুর কি অভাব আছে পৃথিবীতে? বাংলা দেশে কি কম কাণ্ড কারখানা ঘটছে অষ্টপ্রহর! পথে ঘাটে ট্রামে বাসে, মাঠে ময়দানে কত লোক, কত ঘটনা, কত অভিজ্ঞতা। সে সবই ত লেখার উপজীব্য। আর একটু গল্পের আঁচ থাকলেই হল। কথাগুলি পর পর সাজাতে পারলেই রচনা। আর রচনা মানেই ত সাহিত্য! রিয়ালিস্ট রচনা না হলে আজকাল পাঠক সমাজে পাত্তা পায় না সাহিত্যিক। তাই সংসারের খুঁটিনাটি বিষবস্তু থেকে শুরু করে বৈধ অবৈধ প্রেম, নারীর দেহ বর্ণনা, নর-নারীর দৈহিক মিলনের ছবি—সব নিখুঁতভাবে পরিবেশিত হয় ঐ সব রচনায়।

ভারতবর্ষের সেরা শহর কলকাতা। এখানে একদিনের জন্যে যিনি আসবেন বিদেশ থেকে অথবা বাংলা দেশের বাইরে থেকে—তাঁরই মালুম হবে, হ্যাঁ, এসেছি বটে একখানে! এমনটি দেখি নাই কভু ভূ-ভারতে। ট্রামে বাসে চাপো, ধুতি পাঞ্জাবী পরে চাপলে ওর একটা আস্ত থাকলেও অন্যটা আস্ত অবস্থায় পরে বাড়ী ফিরতে হবে না। ধোপার বাড়ী থেকে আনানো প্যান্ট সার্ট পরে একবার ওঠো, ত মনে হবে কতকাল ধরেই না পরছ সেগুলি, এমনি দীন হীন অবস্থা হবে তাদের! পালিশ করা জুতোটি পরে উঠলে

মনে হবে বুঝি পুরোনো জুতোর দোকান থেকে সন্ত কিনে পরেছ ! বাসে ট্রামে যতক্ষণ না উঠছ, যতক্ষণ আছ দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষায় পথের ওপর, উঠতে পারছ না, ততক্ষণ সমানে গাল দিচ্ছ বাস ট্রামের গেট জাম করা লোকগুলিকে—যাদের জন্যে তুমি উঠতে পারলে না। কিন্তু যেই কোনো রকমে যদি কোনোটাতে ঠাঁই পাও এক কদম, ত ব্যস নট নড়ন নট চড়ন। ঐ গেট থেকে সরে পাদমেকং ন ভিতরে গচ্ছামি। রাস্তার ওপর দণ্ডায়মান লোকগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন দৃষ্টি তখন ! নিজে ত উঠে পড়েছ, ব্যস !

দুর্জনেরা বলে বাসে ট্রামে ভেতরে জায়গা থাকলেও যাত্রীরা ভেতরে যেতে চায় না—তার কারণ না কি লেডিজ সীটগুলি। গেটের কাছেই সেগুলি থাকায়, সেখান থেকে বেশী দূরে যেতে মন সরে না কারো। যত মধু ত ঐ ক'টি সীটকে ঘিরেই ! যত বাসনার অনুরনন, যত কামনার আগুন ধুক ধুক করে জ্বলতে থাকে ঐ সীটগুলিকে আশ্রয় করে ! সহযাত্রিনীদের ওঠা নামা—মুহূর্তের স্পর্শ সুখানুভূতি, বাসনার তৃপ্তি !

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা সুরু করো, প্রতি পদে সেখানে মৃত্যুর কোলপাতা। ফুটপাথ সারা বছর ধরেই সারানো হচ্ছে, সারা বছর ধরেই খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে ফুটপাথে, রাস্তার মাঝ মধ্যিখানে; কখনো যাচ্ছে ইলেকট্রিক তার, কখনো টেলিফোনের। এবড়ো খেবড়ো, ইঁট সুরকি থরে থরে সাজানো এখানে ওখানে, কোথাও গর্ত, কোথাও বোজা, কোথাও বা ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা। কোথাও আলো নেই, কোথাও জমে আছে আশ পাশের বাড়ীর স্তূপাকৃত জঞ্জাল, কুকুরে আর ভিখারিতে কোথাও ডাস্টবিন পরিক্রমা করছে। কোথাও পথ দিয়ে হাঁটতে গেলে সামনের বাড়ীর ওপর তলা থেকে নোংরা জলের বালতি উপুড় হয়ে তোমায় স্নান করিয়ে

দেবে, নয় ত কলার খোলায় পা হড়কে ডিগ্‌বাজি খাবে!

মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে প্যারিসের একটি সিনেমা হলে একটি ফরাসী ছবি দেখতে গেছিলাম। ছবিটার নাম আজ আর মনে নেই। বিষয়বস্তুটা এত প্রাঞ্জল যে আজো মনে আছে। সভ্যতার এতবড় স্যাটায়ার বোধহয় বার্ণার্ড শ'ও করতে পারেন নি। একমাত্র ফরাসী দেশেই—যেখানে কালচারের পীঠস্থান, সেখানেই সম্ভব এ স্যাটায়ারের। ছবিটাতে একটি গল্প ছিল, মামুলী একটি গ্রামের গল্প। স্থানীয় 'কর্পোরেশন' গ্রামের লোকদের সুখ সুবিধার প্রতি সতত যত্নবান। 'কর্পোরেশনে'র কাউন্সিলাররা কর দাতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিগ্যেস করেন, 'কি চাই', 'কি ভাবে তাঁরা গ্রামবাসীর সেবা করবেন!' একদিন একজন কাউন্সিলার 'কর্পোরেশনে'র সভায় পেশ করলেন একটি চৌরাস্তার মোড়ে পথচারীদের ব্যবহারের জন্যে 'প্রস্রাবাগার' নেই। তাই ঐ অঞ্চলের পথচারীদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পথচারিণীদের। সঙ্গে সঙ্গে ঐখানে একটি 'প্রস্রাবাগার' নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হল এবং অতি অল্প সময়ে (টেণ্ডার কল করেছিলেন কি না মনে নেই) একটি সুন্দর 'প্রস্রাবাগার' নির্মিত হল সেই চৌমাথায়। কাউন্সিলাররা করদাতাদের সেবা করার আনন্দে গদগদ। একটি মহান কাজ তাঁরা আজ সম্পন্ন করলেন। করদাতাদের একটি বড় অভাব পূর্ণ করলেন। সেই 'প্রস্রাবাগারে'র উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে। স্বয়ং মেয়র ও কাউন্সিলাররা উপস্থিত। গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরাও নিমন্ত্রিত। জনৈক কাউন্সিলার প্রস্তাব করলেন এই 'প্রস্রাবাগার' উদ্বোধন করবেন স্বয়ং মেয়র মহোদয় 'প্রস্রাবাগার' সর্ব প্রথম ব্যবহার করে! প্রস্তাব শুনে মেয়র মহোদয়ের কান দু'টি রাঙা বরণ! এই জন সমাবেশের শত শত উদ্‌গ্রীব চক্ষুর সামনে উদ্বোধন কার্যটি কি ভাবে যে সমাধা করবেন ভেবেই আকুল!

ওদিকে তখন উদ্বোধনী সংগীত বাজছে! শঁপ্যার কোনো গৎই হয় ত বাজছিল—এখন আর মনে নেই! মেয়র মহোদয় হাঁটি হাঁটি পা পা করে চারদিক তাকাতে তাকাতে উদ্বোধন করলেন 'প্রস্রাবাগারে'র সমবেত জনতার তুমুল করতালীর মধ্যে!

বাঙালীর শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম নীতি বিবেক বুদ্ধি মনুষ্যত্ব সব কলকাতার মধ্য দিয়েই ত বিকশিত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে; আর সে সবের জন্যে তামাম শহর জুড়ে এমনি একটা 'আগারের'ই প্রয়োজন ছিল আমাদের। নইলে আমাদের বহুমুখী কালচারের কি দুর্দশাই না আজ হত, ভাবুন ত!

স ম্ব ন্ধ

আমার এক বন্ধু সন্থ বিয়ের পর নতুন প্রেমের স্বাদে ও তরুণী স্ত্রীর অপূর্ব সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ফুলসয্যার রাত্রে তার উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে ওঠে। কিন্তু তার স্ত্রী সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ওমা, তুমি যাত্রা কর না কি?' কথাটা তিনি ঠাট্টার সুরে বলেন নি। স্বামীর এই কাব্যিক উচ্ছ্বাসকে তিনি যাত্রাওয়ালার ঢং বলেই মনে করেছিলেন। এরপর বন্ধুটির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কাব্যচর্চা তার এইখানেই খতম। আরো দু একবার সে কাব্যিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কার্যত স্ত্রীর কাছে হাস্যকর মানুষ বলেই গণ্য হয়ে উঠল। ফলে রূপসী স্ত্রী পেয়েও সে সুখী হতে পারলো না। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তার বিবাহিত জীবনে ভাঙন ধরল। একে ঠেকাতে সে পারল না, কারণ সে ক্ষমতা তার ছিল না। তার জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠল।

এই ঘটনাটি হয় ত তুচ্ছ ; কিন্তু এর পেছনে চিন্তার বিষয় আছে, এবং সেই হিসেবে এর মূল্য অনেক। সুন্দরী স্ত্রী পেয়েও বন্ধুটির জীবন যে ব্যর্থ হয়ে গেল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অনেকে হয় ত বলবেন যে ব্যর্থ হবার কি আছে? কবিতা বোঝবার মতো যথেষ্ট রসবোধ যদি স্ত্রীর না থাকে তাতে ক্ষতি কি? জীবনটা ত আর সে কাব্য করে কাটাবে না! কাজেই কাব্য রস উপভোগের কোনো দাম বাস্তব জীবনে নেই। নিছক সাংসারিক দিক থেকে

দেখলে কথাটা সত্যি বলেই মনে হয়। কিন্তু সংসার অর্থে যেখানে শুধু খাওয়া পরা,—ওঠা বসা চাকরী আর ঘুমই নয়, যেখানে মানুষকে মানুষ নিয়েই সংসার করতে হয় এবং সে-মানুষ দেহ সর্বস্ব নয়, তার মন আছে, সেখানে যদি একজন মানুষ শুধু জড় মাংসপিণ্ড মাত্র হয়, তাহলে এ-যুগে তাকে নিয়ে ঘর করা বিড়ম্বনা মাত্র। শুধু রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর আর আত্মীয় স্বজনের হিতাহিত দেখাই কি স্ত্রীর একমাত্র কাজ? এর বাইরে কি তার কিছুই করবার নেই? তাকে যে কাব্য রস বুঝতে হবে, গান গাইতে হবে, স্বামীর তালে তাল দিয়ে চলতে হবে সে কথা বলি না, কিন্তু তার বোধশক্তি কিছু না থাকলে চলবে কি করে? এ শুধু স্ত্রীদের বেলাতেই নয়, স্বামীরা যেখানে স্ত্রীদের অনুপাতে উপযুক্ত হয় না, সেখানেও এ সমস্যা দেখা দেয়। পুরুষ ও নারী উভয়কে নিয়েই সংসার সমাজ, সেখানে উভয়কেই উভয়ের যোগ্য হতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা ও রুচি না থাকলে বৈষম্য আসবেই এবং সেখানে ঘর ভাঙবার সম্ভাবনা বেশী। এখানে শিক্ষা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ছাপমারা শিক্ষার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষা হবে আসলে মনের। মনকে তৈরী হতে হবে। মানুষের মন ভিজে মাটির ডেলার মত। নিজ নিজ ক্ষমতা ও সুযোগ মতো তার রূপ দেওয়া চলে। দেহের যেমন অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঢাকবার জন্যে প্রসাধনের দরকার, মনেরও চাই প্রসাধন। নিজেকে মানুষ পাঁচজনের সামনে স্নো পাউডারের সাহায্যে সুন্দর করে তুলে ধরতে চায় এবং তার জন্যে কত যত্ন, কত অধ্যাবসায়, কত সাধনা!

আদিম যুগে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ ছিল নিছক দৈহিক উপভোগের। মন সেখানে কোনো আসনই পেত না। তখন মনের যে-টুকু অস্তিত্ব ও সাড়া পাওয়া যেত, সে-টুকু ঐ দৈহিক মিলনের আনুষঙ্গিক হিসেবেই। তার বাইরে মন কোনোদিন

প্রসার পায় নি। কিন্তু আজ সে যুগ নেই। নর নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক আজো আদিম ধারায় চলে আসছে এবং চিরদিন চলবে, কিন্তু মনকে বাদ দিয়ে নয়, মনকে স্বীকার করে। দৈহিক মিলন তাই আজ মনের মিলের ওপরই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

আমাদের মানব সভ্যতার যে বিবর্তন চলেছে যুগ যুগ ধরে, তার মধ্যে আজো অপরিবর্তিত নর নারীর সম্পর্ক। জৈবিক প্রক্রিয়ায় জন্ম যে জীবনের, সে জীবন উর্দ্ধে নয় জৈবিক অনুশাসনের। সেখানে দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ। এ-দেওয়া নেওয়া দৈহিক ও মানসিক। মনকে বাদ দিয়ে নয়, দেহকেই একমাত্র আশ্রয় করেও নয়।

আমার পরিচিত আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে। সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। অত্যন্ত স্মার্ট। চলনে বলনে নাচে গানে বন্দুক চালনায় এবং মোটর চালনায়—কোনোটাতেই সে পেছ পা ছিল না। তাকে দেখা যেত গৃহকোণে বাবা মা ভাই বোনদের সঙ্গে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে ঘর করতে আবার দেখা যেত তাকে কোনো অতি হাল ফ্যাসানের রেস্তোরাঁয়, ক্যাবারে শো'তে।

একদিন তার বিয়ে হল। পাত্র বনেদী ধনী। অনেক পুরুষে বড়লোক। অন্দর বাহির মহল, পাইক পেয়াদা। স্বামী প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। মোটামুটি শিক্ষিত। ঘর দেখে বিয়ে দিলেন মেয়েটির বাবা। সে ঘর ভাঙতে দেরী হল না। অল্পদিনেই মেয়েটি আবিষ্কার করল স্বামীর অনেক গুণ। উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ, কথাবার্তা ব্যবহারে অমার্জিত রুচি, তার নিত্য সহচররা নীচু তলার লোক।

নিজের শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা, জীবন সম্বন্ধে অনেক সুষমিত আশা ও স্বপ্নের উচ্চ প্রাসাদ যে স্বামীকে ঘিরে গড়ে তোলার সংকল্প ছিল মনে—স্বামীর জীবনযাত্রা প্রণালী ও চরিত্রের জন্যে নিজেকে এড়াতে গোড়ার দিকে সমাজ থেকে, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেয়েটি আবদ্ধ করল নিজেকে ঘরের মধ্যে। এমনি

করে পার হয়ে গেল কয়েকটি বছর। তারপর একদিন সে ঘরের দোর খুলল। বেরিয়ে এল মেয়েটি নতুন মূর্তি নিয়ে। চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে, সীমাহীন ব্যাভিচারের মধ্যে ডুব দিল। সাইকলজিতে যাকে বলে reactionery, তাই সে হয়ে উঠল। তার স্বামীও পারল না তার সেই নতুন জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে। তারপর যেদিন বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হল, সেদিন মেয়েটির আবেদন গিয়ে পেঁাছল ডিভোর্স কোর্টে।

যদি ডিভোর্স আইন পাশ না হত, চলত এমনি ধারা জীবন—(না, এ-জীবন নয়, মৃত্যু তাহলে কি !), তাহলে দু'টি জীবন এমনি করেই শেষ দিনটির প্রত্যাশায় থাকতো বসে।

আমার বক্তব্য বিবাহ বিচ্ছেদ আইনকে সমর্থন করা নয়। আমার বক্তব্য নর নারীর মিলন নিয়ে। পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে— যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে একমাত্র সমান সমান লেনদেনের মধ্যে, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যার মিলনে। এ-যোগ্যতা কিসের ? এ যোগ্যতা মনের। মনকে মন টেনে রাখতে পারে একমাত্র ভালবাসা দিয়ে। সংসারে একমাত্র খাঁটী ঐকান্তিক ভালবাসাই পুরুষকে নারীর প্রতি, নারীকে পুরুষের প্রতি নিবীড় আকর্ষণে বাঁধতে পারে। কোনো নীতি নয়, কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নয়—সকল নীতি সকল অনুষ্ঠানের বড় মানুষ। মানুষের মন। মন যেখানে নেই, মানুষের দেহটা সেখানে পড়ে শুধু ছটফট করে বলি দেওয়া ছাগলের মতো ! এ যেন হাঁড়ি কাঠে গলা ঢুকিয়ে অপেক্ষা করা, কখন কোপ পড়ে তার মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে ! আমাদের সমাজ এমনি করে কোপ মেরে এসেছে যুগ যুগ ধরে অসহায় মানুষের ওপর। কতকগুলি নীতির বুলি আর ধর্মের মন্ত্র পড়িয়ে সমাজের হাঁড়িকাঠে দিয়েছে ঝুলিয়ে এক সঙ্গে দু'টি করে জীবন। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করেছে তারা যতদিন না

সত্যকার মৃত্যু এসে বিচ্ছিন্ন করেছে তাদের পৃথিবী থেকে—ততদিন কী মর্মান্তিক যন্ত্রণায়, কী ভয়ঙ্কর মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের দোলায় ছুলতে হয়েছে তাদের জীবনভোর!

কেন? না, আগুন আর শালগ্রাম শিলার সামনে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে যাদের ঘিরে, সে মন্ত্রের এমনই শক্তি যে তার ক্ষয় নেই, লয় নেই। অবিনশ্বর সে মন্ত্র—মানুষের জীবনের চেয়েও! জীবনের মূল্য মন্ত্রের বুলির কাছে চিরদিন নগণ্য হয়ে থেকেছে।

আমি এ-কথা বলছি না যে আগুন ও শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী রেখে মন্ত্র পড়ে যারা ঘর বেঁধেছে—তাদের সবার ঘর একদিন ভেঙেছে। সফল হয় নি তাদের জীবনে মিলনের সে মন্ত্র। সফল নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু সে কি ঐ মন্ত্রের জোরেই? না, সফল হয়েছে ভালবাসার জোরে। যেদিন আমাদের সমাজে গৌরীদান প্রথা ছিল, সেদিন সমস্যা ছিল না। সমস্যা তখন থেকেই দেখা দিল যেদিন দু'টি পরিণত মন নিজেদের আজন্ম শিক্ষা দীক্ষা রুচি ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক হতে আরম্ভ করল বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। একটা বাঁধা ছক থেকে সরে এল তারা দু'জনেই। অভিজ্ঞ পরিণত মন, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, শিক্ষার তারতম্য—সব কিছু সঙ্গে নিয়ে দু'টি জীবন-যোজনা—যদি সফল হল, ভাল, না হলে সে দায়িত্ব কার?

আজ সেজন্যে বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলে এ-কথাটাই সব চেয়ে বেশী মনে রাখতে হবে—পাত্র পাত্রীর শিক্ষা দীক্ষা কেমন, জীবনের আদর্শ ও উচ্চাশা কেমন। কেমন তাদের মনের গঠন। পাত্রের বাবা যদি লেনদেনের হিসেব কষতে বসেন, পাত্রীপক্ষ কত যৌতুক দেবে, দেবে কত ভরি সোনাদানা, আসবাবপত্র—সেই সঙ্গে ভুলে যান তাঁর পাত্রের গুণাগুণ, পাত্রীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচার, তাহলে, এতদিন এই রকমের সম্বন্ধ চললেও, ভবিষ্যতে চলবে না! যতই

শিক্ষার প্রচার বাড়চে, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, মেয়েরা শিক্ষিতা হচ্ছে—ততই ছেলেদের দিক থেকেও সেই পরিমাণে শিক্ষিত হতে হবে। এ শিক্ষা স্কুল কলেজী শিক্ষাই শুধু নয়—এ শিক্ষা হবে কালচারের। বি, এ, এম-এ পাশ করাটা কঠিন নয়। একটু বুদ্ধি শুদ্ধি থাকলে, অধ্যাবসায় থাকলে সকলেই পাশ করে—কিন্তু 'কালচার্ড' হতে হলে শুধু সেই স্কুল কলেজী শিক্ষাতেই কুলোয় না, তার সঙ্গে চাই আরো অন্য কিছু। আর সেই অন্য কিছু না হলে শিক্ষাও পুরো হয় না। তাই বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলে পাত্রপক্ষ যদি নিজের 'কালচার্ড' ছেলের সঙ্গে 'কালচার্ড' মেয়ের বিয়ে না দেন, শুধু বৈষয়িক দিকটাই দেখেন, তাহলে বেশী দিন টিকবে না সে সম্বন্ধ। পাত্রীপক্ষকেও সতর্কভাবে তাঁর মেয়ের 'উপযুক্ত' পাত্রেরই সন্ধান করতে হবে!

যেখানে ছেলেরা বা মেয়েরা নিজেরাই স্বয়ংবরা—সেখানেও অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গেই নিজেদের জীবনের সাথী নির্বাচন করা উচিত। নইলে শুধু মাত্র ভাবপ্রবণতার জন্যে নিজেদের চিরজীবনের মতো অনুপযুক্ত হাতে সঁপে দেওয়া ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার পরিচিত একটি মেয়ে—শৈশব থেকে কনভেণ্টে পড়া, লরেটো কলেজ থেকে পাশ করা—সে হঠাৎ প্রেমে পড়লো এক অতি সাধারণ ছেলের। অত্যন্ত সাধারণ শিক্ষিত। মেয়েটি শুধু উচ্চ শিক্ষিতাই নয়, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এবং ধনীও। ছেলেটি সেই অনুপাতে দরিদ্র। মেয়েটি 'লাভ-ম্যারেজ' করলো বাড়ীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বাড়ীর লোকেরা শেষে মেনে নিল সে বিয়ে। তারপর নিজেদের মেয়ের উপযোগী করে 'জামাইকে' তৈরী করবার জন্যে টাকা খরচ করে বিলেত পাঠাল। সে 'জামাই' বিলেত গিয়ে আর ফিরল না। বোধহয় সেখানে আর কারো 'জামাই' আদর খাচ্ছে!

এ-ক্ষেত্রে বলবো মেয়েটি তার জীবন-সঙ্গী নির্বাচনে ভুল করেছিল। আজ তার জন্যে তাকে দুঃখ পেতে হচ্ছে। আজকের দিনে 'সম্বন্ধ' করাটা যেমন সহজ নয়, সম্বন্ধ পাকা হলে, তাকে টিকিয়ে রাখাও তেমনি শক্ত! যদি সে সম্বন্ধকে নিছক সামাজিক বা পারিবারিক মনে করে, ধর্মীয় আচার বলে গ্রহণ করা হয়; মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—মনের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ বলে গ্রহণ না করা হয়—তাহলে সে ধরণের সম্বন্ধ ভাঙতে বেশী দেরী হবে না।

বর্তমান অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে না চললে, শুধু অতীত দিনের ক্রিয়া কলাপ এবং রীতি নীতিকে আঁকড়ে থাকলে ঠকতে হবে। সম্বন্ধ বিচার করতে হবে মেয়ে পুরুষের 'মানসিক' গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে। এ কথা ভাল করে ভেবে দেখার দিন এসে গেছে।

শিল্পীর নগদ বিদায়

আমার তখনই নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়, যখন আমি একটি নতুন লেখা শেষ করি। মনে হয় আমি এক রাজ্যের রাজকুমার—আমার হাতে সোনার কাঠি। কাগজের শ্বেত-শয্যা থেকে ঘুম ভাঙাচ্ছি কোন্ এক অপরূপ রাজকুমারীর! এক একটি অক্ষরের মধ্যে দিয়ে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে তার মুখ, চোখ, নাক ও সর্ব শরীর। চোখ মেলে আমার সঙ্গেই প্রথম তার দৃষ্টি বিনিময় হয়। সে হাসে; আর ঐ হাসি আমার অন্তরে সংক্রমিত হয়, আমিও হাসি। আমার রক্ত-স্পন্দনে, ধমনীতে খুশীর বেগ উদ্দাম হয়ে ছোটে। আমার রাজকুমারী জাগে। যে ছিল আমার অবচেতনে, অতীন্দ্রিয় লোকে, তাকে আমার এই সোনার কাঠির স্পর্শে জাগালুম! আমি রাজকুমার,—ভালবেসে আমার রাজকুমারীকে সাজাই অলংকারে, ব্যঞ্জনায়। যতক্ষণ না তাকে সুন্দর, আরো সুন্দর, নিখুঁত করে তুলতে পারি, যতক্ষণ না তার রূপের উজ্জ্বলতা বাড়ে, ততক্ষণ আমার সাজানোর বিরাম নেই, স্বস্তি নেই। যখন সে সর্ব অঙ্গে সুষমা নিয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে, আর সেই রূপ নিয়ে আমার দিকে চায়, আমার প্রাণে সাড়া জাগে! সেই ত আমার আনন্দ—সবার সেরা, সবার বড়। কারো অপেক্ষা রাখে না। আপনাতে আপনি তৃপ্ত; সেই ত আমার পুরস্কার।

আর সকল স্রষ্টারই এই পুরস্কার! শিল্পীর এখানে নগদ

বিদায়। এর পর তার সৃষ্টির মূল্য কে দিল, কে তার প্রতিভা বুঝল এ সব নিয়ে স্রষ্টার মন ব্যস্ত হয় না। কী আসে যায় যদি কেউ বলে তোমার সৃষ্টি সুন্দর হয় নি, বা এ কি হয়েছে!

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বাসর-ঘরে বর এবং পাঠক-সভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। সহ্য যে করে তার কারণ এই, একটা জায়গায় তাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর, তার কনেটিকে কেউ হরণ করবে না; এবং যে লেখক, তার লেখাটা ত রইলই।

তবু এখানে একটা কথা রয়ে যায়। শিল্পীর বা স্রষ্টার দানের স্বীকৃতি যদি অপরের কাছ থেকে না পাওয়া যায় তাহলে সে দানের মূল্য কতখানি? অপরের স্বীকার অস্বীকার কি শিল্পীর কাছে একেবারেই নিরর্থক? তিনি কি অনায়াসে এ-সব অবহেলা করতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ললিত-সৃষ্টিতে যখন প্রথম দিকে মানুষ খানিকটা চলে আধ আলোর রাজ্যে তখন অপরে যদি উৎসাহ দেয়, তাহলে দেখা যায় ছায়া কাটে আলো বাড়ে। সে সময়ে তাই বড় কৃতজ্ঞ বোধ হয় যখন দেখি আমি যা উপলব্ধি করছি অপরের মনেও তার রং ধরেছে—তাই না সে সায় দিল প্রশংসার ঢেউ তুলে। কিন্তু পরে—যখন আমাদের মধ্যে আত্ম-প্রতীতি দানা বাঁধে, গোধূলির ছায়া যখন আলোর কাছে হার মানে, তখন কী দরকার অপরের স্বীকৃতির? তখন কি মনে হয় না—আমি যা পেয়েছি তা যখন নিশ্চয়ই পেয়েছি, তখন অপরের না করায় তো আর সেটা না-পাওয়া হয়ে যেতে পারে না? আনন্দ হল সৃষ্টির অনুসংগী—সে যখন এসে বলে, অহময়ং ভো—আমি আছি হে, তখন তাকে নামঞ্জুর করবে সাধ্য কার?"

ঠিক কথা, শিল্পী সৃষ্টি কার্যে এমন এক স্তরে গিয়ে ওঠেন তখন

কে কি বললো না বললো এ নিয়ে তাঁর ঔৎসুক্য থাকে না। নিজের মনের তাগিদেই তিনি সৃষ্টি করেন। মন এক বার শিল্পীকে সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, অন্য পক্ষে তাঁর আনন্দ যোগায়। এমনি করে শিল্পী আপনাতে আপনি পূর্ণতা লাভ করেন। তবু খট্‌কা লাগে যে এ হলেই কি সব হল? নিজেকে নিয়ে মেতে থাকলেই কি শিল্পীর ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে? এর বাইরে কি কিছুই নেই? আছে—প্রত্যেক স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টিতে আনন্দ পেলেও চান লোকে তাঁর সৃষ্টি বুঝুক, তাঁর দান, তাঁর প্রতিভাকে যোগ্য মর্যাদা দিক। বিচার করে বলুক—হ্যাঁ এ যা হয়েছে তা সত্যিই সুন্দর! মহৎ সৃষ্টি! আর তারা স্রষ্টার গলায় পরিয়ে দিক জয়মাল্য—প্রতিদানে ভরে তুলুক তাঁর ঝুলি; অন্তরে ও বাইরের সম্পদ তাঁকে উদ্দীপ্ত করুক।

রবীন্দ্রনাথ যে স্তরের শিল্পী ছিলেন, সে ছিল এই চাওয়া পাওয়ার অতীত স্তর। তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতেন মানুষের নিন্দা প্রশংসা, খ্যাতি যশ। যদিও মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসাকে তিনি কখনো হীন বা তুচ্ছ ভাবেন নি। দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছেন যখনই অপর তাঁকে দিতে চেয়েছে। আর প্রত্যেক স্রষ্টাই (ছোট বড় শ্রেণী ভেদ না করেই বলা যায়) এই চাওয়া পাওয়াকে অনেক উচ্চে স্থান দেন, যদিও সে ইচ্ছা পুরোপুরি মনের অতল গভীরে ডুবে থাকে, স্রষ্টা নিজেই অনেক সময় টের পান না।

এই যে পাওয়া অথবা না-পাওয়া, এর ওপর শিল্পীর মন অনেক খানি নির্ভরশীল। সস্তা হাততালিকে তিনি অবশ্যই ঘৃণা করেন, উচিত প্রাপ্য পেলেই তাঁর মন খুশী। সে খুশীর স্বাদ শিল্পীর মনে রঙের আলো জ্বালিয়ে দেয় আর সে আলোয় তিনি নিত্য নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পান। অনেক সময় তাই এ-প্রাপ্য না পেলে তাঁর মন হতাশ হয়ে পড়ে, সমস্ত উৎসাহ লোপ পেতে বসে, মনে হয় সব বুঝি ব্যর্থ,

মূল্যহীন। যতই শিল্পী আত্মভোলা হন, যতই তাঁর মন আত্মকেন্দ্রিক হোক, সর্বত্যাগী হোক, প্রতিদান না পেলে তাঁর প্রেরণার সব পথ যেন বন্ধ হয়ে যায়। মনের তাগিদে তিনি তখনো শিল্প সৃষ্টি করে যাবেন কিন্তু সে-সৃষ্টিতে প্রাণের অভাব থাকবে। আর এই প্রাণের অভাব যেখানে, সেখানে সত্যকার সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ প্রাণহীন সৃষ্টি কিম্বা সুষমাহীন সৌন্দর্য অসম্ভব। তাই মানুষের কাছে শিল্পীকে হাত পাততে হবে। তাদের উপলব্ধি, তাদের প্রশংসার জন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে।

এখন কথা এই যে সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পী উচ্চস্তরের মানুষ। তাঁর চিন্তা, ব্যক্তিত্ব, বোধ, অনুভূতি সব সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী, অনেক সুক্ষ্ম, অনেক তীক্ষ্ম, অনেক গভীর। সাধারণ মানুষের মন থেকে অনেক উচ্চে শিল্পীর মানস-লোক। তাই সাধারণের কাছে শিল্পী যেমন দুর্বোধ্য, দূরাশ্রয়ী জীব, তেমনি তাঁর সৃষ্টিও সাধারণ মানুষের ভালো মন্দ বিচার বুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাই শিল্পীকে বোঝা, তাঁর প্রতিভাকে গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই জন্যে শিল্পী তাঁর দানের যোগ্য সম্মান বা প্রাপ্য পান না। উল্টে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল মত ও বিচারে আক্রান্ত হন। শিল্পীর মনে হয় তিনি হয় ত সত্যই কিছু দিতে পারেন নি, নয় ত যা দিয়েছেন তা তেমন কিছু নয়। এইখানে শিল্পীর সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে ভুল বোঝার অবকাশ গড়ে ওঠে। শিল্পীও নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এর থেকে মুক্ত ছিলেন না।

শিল্পীর সঙ্গে মানুষের সঠিক বোধাপড়া তাই কোন যুগে সম্ভব হয় নি। পারিপার্শ্বিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পীর মন যেখানে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বহুদূর প্রসারী হয় সেখানেই সাধারণে তাঁর নাগাল পান না। এই বিশ শতকেও সভ্যতাগর্বি মানুষ, যারা

সকল বিষয়েই নিজেদের অবিসম্বাদিত রূপে বোদ্ধা মনে করে, তারাও শিল্পীর কদর ঠিক বোঝে না। অথবা অতিরিক্ত যান্ত্রিক-মন হওয়ার দরুণ ভাবে এই সব ললিত সৃষ্টি নিষ্কর্মা লোকের খেয়াল খুশী, কিম্বা এর কোনো মূল্যই এই পার্থিব জগতে নেই। অবশ্য এঞ্জেলো, ভিন্সির শিল্প প্রতিভা বা বিটোফেনের সংগীত সৃষ্টির মর্যাদা এই মানুষই করেছে এ অনস্বীকার্য; কিন্তু এরাই আবার শেক্স্পীয়র, শেলী, কীটশ এর প্রতিভাকে চিনতে পারে নি। তার কারণ এঞ্জেলো ভিন্সির ভাব বস্তুকে আধার করেই প্রকাশমান, এবং সংগীত-প্রিয়তা মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি। কিন্তু শেক্সপীয়র প্রভৃতির ভাবের বাহন ভাষা—যা আসলে কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র এবং সেই অক্ষরের সারি ভেদ করে ভাবে পৌঁছনো সাধারণের পক্ষে শক্ত। অবশ্য মানুষ ঐ সুক্ষ্ম ভাষার অতীত ভাবে পৌঁছতে যে পারে না তা নয়, এক সময়ে সে নিশ্চয়ই সে-ভাষার ইন্দ্রজাল কাটিয়ে ভাবের সত্য ও সুন্দর রূপ দেখতে পায়। কিন্তু এই বহু সমস্যাপীড়িত, দুঃখ দুর্দশা জর্জরিত পৃথিবীতে মানুষের অত সময় কই? একটা ছবি বা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অথবা ভালো গান শুনে অল্প সময়েই যেমন তাকে উপলব্ধি করা চলে, সাহিত্য-সৃষ্টিকে সেভাবে কম সময়ে বোঝা তার পক্ষে দুরূহ। তাই প্রকারান্তরে এ-সবের মূল্য খুব কম লোকই স্বীকার করতে চায়। কিন্তু এতো ঠিক যে মানুষ চিরদিন মানুষই থাকবে, বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের দিনেও সে যন্ত্রে পরিণত হবে না; কারণ মানুষের মন বলে একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে এবং যখম মানুষও থাকবে তখন মনও মরবে না। আর শিল্পী মনের পাওনা যদি নগদ কিছু নাও মেলে, তা হলেও তার দাবী চিরকালের ভেতর দিয়ে মানব-মনের কাছেই বারবার হাত পাতবে।

ভারতের রাজনীতি

পূর্বকালের রাজারা ছিলেন দস্যু। যিনি যত বড় রাজা তিনি তত বড় দস্যু। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিষ খাঁ, তৈমুর লং, মামুদ ঘোরী সবাই এঁরা দস্যু, মহাদস্যু। গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ অভিযান করে, অত্যাচার করে, বিশৃঙ্খলা বিভীষিকা এনে মানুষের সুখ শান্তিপূর্ণ জীবন ও কুটিরে অশান্তির ও দুঃখের আগুন জ্বেলে উল্লাসে এঁরা আত্মহারা হতেন। দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য ছারখার হয়ে গেছে এঁদের খেয়ালের তাণ্ডবে। হাহাকার উঠেছে প্রতি ঘরে।

ভারতবর্ষ এই সব দস্যুদের অভিযানের মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্র হয়েছে বরাবর সেই প্রাচীন যুগ থেকে। সোনার দেশ হিন্দুস্থান। দস্যু দল উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, হিন্দুস্থান! আশমানের চাঁদ এই হিন্দুস্থান—তাদের স্বর্গ ও নরক। হিন্দুস্থানের স্বর্গে এরা নরক সৃষ্টি করে গেছে। সবাই এসেছে একে একে স্বর্ণভূমিতে ঘোড়া ছুটিয়ে, ধূলো উড়িয়ে, তাদের কোমর বন্ধে অসির ঝকমক, এক হাতে বল্লম আর হাতে অশ্বের বল্গা, শিরে শোভিত দীপ্ত উষ্ণীষ; দস্যুর দল এসেছে সোনার লোভে। এর পর্বতে কন্দরে কন্দরে সম্পদ; এর মাটির নীচে সোনা, লোহা, রূপো, তাম্র, অভ্র, এর সমুদ্র তলে মুক্তো মাণিক্য, চুণি পান্না গোমেদ পোখরাজ। দস্যু দল দেখে আর উল্লসিত হয়—এত সোনা! এত জহরৎ! দৃষ্টি স্তম্ভিত, নির্বাক বিস্ময়! তারা নিয়ে যায় মুঠো মুঠো সোনা

হীরে মুক্তো। জোববার থলিতে, কোমর বন্ধের পেটিতে, বড় বড় সিন্দুকে, ঘোড়ার পিঠে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে ধূলো উড়িয়ে চলে যায়। ফিরে যায় দেশে, মন পড়ে থাকে পেছনে, তাই আবার আসতে হয়। আবার নিয়ে যায় সোনা আর জহরৎ।

হিন্দুস্থানের বাসিন্দাদের পরনে এক বস্ত্র। তারই এক অংশ অনাবৃত দেহে জড়ানো। দীর্ঘ দেহ ; মাথায় নেই উষ্ণীষ, পায়ে নেই চপ্পল, হাতে নেই অসি, উন্নত সুগৌর মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, আয়ত চোখ, বিম্ব অধর, হাতে কারো কমণ্ডলু কারো খঞ্জনি, কারো পুঁথি। অরণ্যে প্রান্তরে, পর্বতে, কন্দরে নদীর তীরে গোলপাতার কুটিরে বাস। মাটিতে শয়ন, ফলমূল আহার। কেউ কমণ্ডলু, কেউ খঞ্জনি, কেউ পুঁথি রেখে বসে—কেউ ধ্যানস্থ, কেউ সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

* * *

তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি॥'

হে সূর্য! স্বর্ণময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করেছ। সত্যধর্মী আমি যাতে তা দেখতে পাই, সেজন্যে সে আবরণ অপসারিত কর।···আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রয়েছেন, তা আমিই।

পথের ধূলোয় ছড়িয়ে থাকে সোনা, সমুদ্রের সৈকতে সৈকতে ঝকমক করে হীরে মুক্তো চুণি পান্না, মাটির নীচে পড়ে থাকে তাম্র লৌহ অভ্র। ভ্রূক্ষেপহীন চিত্ত নির্বিকার। তালপত্রে লেখনীর চর্চা চলে। পর্বত গুহাভ্যন্তরগুলি শিল্পীর আঁচড়ে চিত্রিত খোদিত হয়, অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় মহীরুহের নীচে হরিণশিশু

সিংহ শাবক নিয়ে খেলা করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, নদীর পাড়ে, বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় মেয়েরা, তাদের পরনে কাঁচুলি আর ঘাঘরা, অঙ্গে চম্পক ওড়না, কবরীতে পুষ্প স্তবক, হাতে বলয়, গলায় পুষ্পহার। তারা খুশীতে উচ্ছল; যৌবনে উজ্জ্বল, গান গায় কম্রকণ্ঠে, হরিণ শিশু লাফাতে লাফাতে আসে, শশক ময়ূর আসে ছুটে। পাখিদের কাকলিতে চতুর্দিক যায় ভরে; গহণ অরণ্যের ভয়ঙ্কর জন্তুর দল তর্জন গর্জন থামিয়ে দেয়, বিষধর সাপ পায়ের কাছে ফণা তুলে গান শোনে। মুণি ঋষিরা বসেছেন ধ্যানে। কেউ এক বছর, কেউ বা কয়েক বছর, কেউ অসংখ্য বৎসর।

দেশের রাজা তাঁর রাজ্য শাসন করেন। দরবার বসে প্রত্যহ। বিচার হয়, অপরাধীর নয়; বুদ্ধির, হয় বোধির। আলোচনা ওঠে, তর্ক চলে, বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত সভাসদ—, কেউ দর্শন, কেউ কাব্য, কেউ জ্যোতিষ শাস্ত্র, কেউ ব্যাকরণ, কেউ নীতি শাস্ত্র, কেউ গণিত, কেউ কলার বিশারদ। রোদে পথ চলতে কষ্ট হয়। পথের ধারে ধারে দীর্ঘ ছায়াময় বৃক্ষ, কূয়ো আর সরাইখানা। জ্ঞানের কথা, ধর্মের কথা, নীতির কথা খোদিত পথে প্রান্তরে, শিলালিপিতে। পর্বতগুহাবাসী নির্জন তপস্বীর ধ্যানে, তপোবন-বাসীর নিভৃত পাঠ কক্ষের পুঁথিতে, মেয়েদের সংগীতে ভেসে আসে বেদের মন্ত্র, উপনিষদের স্তোত্র; কোথাও ভাসে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি,

আর্যাবর্ত ও পরবর্তী হিন্দুস্থানের এই রূপ, এই হচ্ছে ইতিহাস। এরপর দলে দলে দস্যুরা এসে ভেঙেছে এই পর্বতগুহার নিস্তব্ধতা, তপোবনের শান্তি,—অরণ্য প্রান্তরের নির্বাক রূপকে করেছে ভীত সন্ত্রস্ত। লুণ্ঠিত হয়েছে স্বর্ণভূমি, গেছে প্রাণ। কোথাও মানুষ

বাধা দিয়েছে এই শান্তি ভঙ্গকারীদের। কোথাও রাজা বীরবিক্রমে এদের স্পর্ধাকে, এদের দুর্বার লোভকে আঘাত করেছেন। কোথাও হার হয়েছে, কোথাও জিত। রাজারা সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। গুণী জ্ঞানী ছিলেন, সামরিক কৌশলটাকে আয়ত্ব করেছিলেন কারো ওপর প্রয়োগ করবার জন্যে নয়, পরের দেশের শান্তি হরণ করবার জন্যে, পর রাজ্য গ্রাস করার জন্যে নয়, শিখেছিলেন অন্যতম বিদ্যা হিসাবে। দেশের অধিপতিকে হতে হয়েছে সকল বিদ্যাপারদর্শী। কিন্তু এই রাজারা রাজনীতি জানতেন না। রাজনীতি জানতেন না বলেই তাঁদের বিদেশীর কাছে হার হয়েছে, হিন্দুস্থানের ভেতর যদি বা কোনো দুই রাজ্যে মত বিরোধ বা সংগ্রাম হয়েছে হিন্দুস্থানের বাইরে কেউ কোনদিন যান নি। অশোকের মত দুর্ধর্ষ সম্রাটের রাজ্য বিস্তারে ঘৃণা এসেছে, যুদ্ধের বাণী নয়, শান্তির ও প্রীতির বাণী বাহক পাঠিয়েছেন দেশ বিদেশে। এঁদের কারো বীরত্বের অভাব ছিল না, ছিল পর রাজ্য লোভের অভাব। ছিল রাজনীতির অভাব। ছিল পুরুর মানব-নীতি। রাজনীতি ভারতের নিজস্ব জিনিস নয়। এ এসেছে পাঠানদের কাছ থেকে, মুঘলদের কাছ থেকে, এসেছে ইংরেজ বণিকের কাছ থেকে। প্রাচীন মহাভারতের একমাত্র প্রথম ও শেষ রাজনীতিক হলেন শ্রীকৃষ্ণ। রূপে গুণে সৌর্যে বীর্যে সম্পদে ভাবে কর্মে শ্রীকৃষ্ণ শুধু তখনকারই নয়, চিরকালের মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রতীক। তাই যে রাজনীতির অভাব আর্যাবর্ত ও হিন্দুস্থানের রাজাদের ছিল, সেই রাজনীতি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন বিস্ময়কর রাজনৈতিক দর্শন। যে রাজনৈতিক দর্শনের রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণে গ্রীক দার্শনিকরা সাধনা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজনৈতিক দর্শন সৃষ্টি করে গেছেন, যার ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ, ভাই ভাই-এর রক্তে যে রাজনীতি রঞ্জিত, ন্যায় ও সত্য যে রাজনীতির প্রথম ও

শেষ কথা এবং লক্ষ্য—তাই ভাই-এর বুকে শর নিক্ষেপে ভাইকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। অন্যায় অসত্যের ওপর তাঁর রাজনীতি নয়। কিন্তু পরবর্তী যুগে পৃথিবীর অন্যত্র ও সর্বত্র রাজনীতির ধারা ও রূপ পুরোপুরি অন্যায় ও অসত্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ন্যায় ও সত্যের কোনো স্থান সে রাজনীতিতে নেই। শ্রীকৃষ্ণ ছল বল ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন লক্ষ্য ও পথকে ন্যায় এবং সত্য জেনেই, সেজন্যে তিনি ছোটখাটো অন্যায় কাজ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি, কিন্তু অন্যান্য দেশের রাজরীতিতে ছল বল ও কৌশলের প্রয়োগ হয়েছে ন্যায় ও সত্যের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অসত্যের প্রতিষ্ঠা কল্পেই। পৃথিবীর সকল দেশের রাজনীতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির প্রভেদ এইখানেই। আধুনিক কালে রাজনীতির এই রূপটাই একমাত্র রূপ ও পথ। কিন্তু আজকের ভারতবর্ষও তার সেই সনাতন ও শাশ্বত ঐতিহ্য ভোলে নি। তাই গান্ধীজী শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য শিষ্য এবং তাঁর রাজনীতিও ন্যায় ও সত্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাঁর এই পথ ভারতের স্বাধীনতার পথ। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র সংগ্রামের ওপর যে স্বাধীনতার স্বপ্ন-সৌধ গড়ে উঠেছে। গান্ধীজী নেতা হিসাবে হার জেনেও তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে লাঞ্ছনা ও ধিক্কার শুনেও কখনো কোনো অবস্থাতেই তাঁর নিরস্ত্র সংগ্রামকে অস্ত্র সজ্জিত করেন নি। তাঁর সমগ্র জীবন এই আদর্শের প্রতি অভূতপূর্ব আস্থা ও বিশ্বাস রাখার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানতেন ও চিনতেন ইংরেজকে—তারা মানুষ হিসেবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি, অনুকরণীয়, কিন্তু যেখানে স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, যেখানে জড়িত তাদের জাতিগত সত্ত্বা, সেখানে তারা কারো নয়, সেখানে তারা অতি নীচ, বিষধর সাপের মতই ভয়ানক। কিন্তু এই নীচ বিষধর সাপের উদ্যত ও উন্নত ফণাকে প্রতিহত ও বিনষ্ট করবার জন্যে

গান্ধীজী আর একটি বিষধর সাপ আনেন নি, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র তিনি চান নি। যদিও তাঁর এই নীতির ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক ধীরে ও বিলম্বে এগিয়েছে, তবু তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরলেন না। ন্যায় ও সত্যের জন্যে ভাইএর বিরুদ্ধে ভাইকে সশস্ত্র প্ররোচনা ও উৎসাহ দেবার রাজনীতি হল শ্রীকৃষ্ণের, আর ন্যায় ও সত্যের জন্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রামকে অহিংসা, সত্য ও প্রীতির দ্বারা পরিচালিত করার রাজনীতি হল গান্ধীজীর। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও গান্ধীজীর এই আশ্চর্য বিপরীত মুখী সংগ্রাম পৃথিবীর এক অচিন্ত্যনীয় ঘটনা। রাজনৈতিক দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ একদা যুগান্তর এনেছিলেন, আজ গান্ধীজীও এক যুগান্তর আনলেন। তিনিই ত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব যাঁর অঙ্গুলি হেলনে আসমুদ্র হিমাচল চল্লিশ কোটী নর নারী চঞ্চল হয়ে ওঠে—একবার মাত্র যাঁর মুখের কথায় বা মৌন সম্মতিতে চল্লিশ কোটী নর নারীর আশি কোটী বাহুতে অস্ত্র ঝনঝন করে উঠতে পারতো—যে শক্তির কাছে দাঁড়াবার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো থাকতো না, ইংরেজের ত নাই-ই। এত বড় শক্তির অধিকারী হয়ে এত বড় বিশাল ক্ষমতা ও আসনের অধিকারী হয়েও তিনি জীবনে কখনো উচ্চারণ করলেন না, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, অস্ত্র হাতে নাও। তিনি বললেন অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রকে প্রতিরোধ কর না, তুমি অহিংস, তুমি সত্যাগ্রহী। তুমি হিন্দুস্থানের সেই মহান ভারতের মানুষ, অস্ত্র তোমার জন্যে নয়। প্রীতি ও মৈত্রী হল তোমার অস্ত্র। তাই দিয়ে এগিয়ে যাও তোমার শান্তি ভঙ্গকারী সুখ সম্পদ বিনষ্টকারী স্বাধীনতা অপহারী শত্রুর দিকে। পৃথিবীর কোথাও এমন কথা আগে শোনা যায় নি। ভারতবর্ষেই তা সম্ভব। ধ্বংসের পূর্ণ ক্ষমতা যাঁর করায়ত্ত, সৃষ্টির ও শান্তির বাণী তিনিই ত শোনাতে পারেন। মহেশ্বরের সংহার-মূর্তি সুপ্ত

শ্মশানের কংকাল ভূত প্রেতের অন্তরালে, ছাই ভস্মের স্তুপের মধ্যে। ভারতের আদর্শ এই মহেশ্বরের রূপ ও প্রকৃতির ছাঁদেই গঠিত। ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সর্বোচ্চ পাত্র হয়ে, অর্জি হুকুমতে আজাদ হিন্দের বিধাতা হয়ে এই ভারতেরই সুভাষচন্দ্র তদানীন্তন মহা-পরাক্রমশালী জাপানের দুর্ধর্ষ প্রধান মন্ত্রী তোজোকে সগর্বে ও সমুন্নত ঔদ্ধ্যত্বে বলতে পারেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে হবেন তা ভারতবাসীই স্থির করবে—সে সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার অধিকার নেই। সেখানে আছেন মহাত্মা গান্ধী, আছেন জহরলাল, প্যাটেল আজাদ। পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় হয়ে যিনি চিরকালের অমরতা বরে অভিষিক্ত হয়েছেন, অলৌকিক সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী সেই দিব্যপুরুষ তোজোর প্রশংসা ও সম্মান হেলায় তুচ্ছ করেছেন। ভারতবাসীর স্নেহ ও প্রীতি তাঁর লক্ষ্য ছিল; সম্মান নয়, এমন কি শ্রদ্ধাও নয়। ভারতের স্বাধীনতা তাঁর স্বপ্ন ছিল, নিজের রাষ্ট্রপতির পদ নয়। এই ভারতবর্ষেই এমন সব মহাপুরুষদের জন্ম সম্ভব হয়েছে। এই সেই বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত গীতা ত্রিপিটক লিখিত দেশ, এখানে বাল্মিকী বেদব্যাস চরক সুশ্রুত নাগার্জুন মনু পরাশর ভরত যাজ্ঞবাল্ক্য গার্গী মৈত্রেয়ী লীলাবতী খনা শংকরাচার্য আবির্ভূত হয়েছেন; এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ মহাবীর নানক কবীর চৈতন্য রামকৃষ্ণ, আধুনিক কালে রামমোহন বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র অরবিন্দ গান্ধী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি লোকোত্তর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন এই ভারতেরই মহামানবের সাগরতীরে। এই ভারতই মানুষকে অমৃতের সন্তান বলে সম্বোধন করেছে। এই ভারতের সাগর তীরে তাই হীরে মুক্তো মাণিক্য জহরৎ ঝকমক করে কিন্তু কেউ ফিরে চায় না সেদিকে, কারণ তাদের দৃষ্টি এই সব মহাপুরুষদের জ্যোতিতে আরো বেশী উজ্জ্বল; তাই মাটির নীচে পড়ে থাকে সোনা রূপো তাম্র

লৌহ ম্যাঙ্গানীজ অভ্র—কারণ এ দেশের লোক আকাশের সম্পদ পেয়েছে, সর্ব প্রকার দুঃখ ও বেদনাকে, সংঘাত ও দ্বন্দ্বকে জয় করেছে—এ দেশের পরম কথা ও উপনিষদের চরম কথা এরা জানে, সেটি হচ্ছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ থেকেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আনন্দেই সমস্ত বাঁচে, আনন্দের পানেই সমস্ত চলে।

অমৃতের সন্তান এই দেশের মানুষ—মৃত্যুকে জয় করেছে, তাই জীবনের প্রতি মমত্ব তার কম, জীবনের মূল্য তার কাছে বড় নয়। এই বৈরাগ্যই তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, দেহে ও মনে, কাব্যে সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে—সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রতি ছত্রে, ভারতীয় জীবনের মর্মলোকে। মরণকেই সে শ্যাম সমান মনে করে, জীবনকে নয়। তাই তার সুখের নীড় ভাঙলেও, শান্তি নষ্ট হলেও, যথা সর্বস্ব গেলেও দুঃখ হয় না, তার জন্যে সে কাতর হয় না। ভারতের বুকে শুধু এই জন্যেই বিদেশীরা সেই সুপ্রাচীন যুগ থেকে বর্বরোচিত অভিযান চালিয়েছে, অত্যাচার করেছে, দলিত মথিত নির্যাতিত করেছে, ঘরের শান্তি নষ্ট করেছে, মুখের অন্ন নিয়েছে কেড়ে, পরনের বস্ত্র নিয়েছে ছিনিয়ে—কিন্তু তার জন্যে এই বৈরাগী জাত কোনোদিন এই সব অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি, যখন দাঁড়িয়েছে তখন তার পেছনে সমগ্র জাতির সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল না। তাই পলাশীর মাঠে, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ও বেয়াল্লিশের বিপ্লবে এদের হার হয়েছে। এই সুপ্রাচীন দেশের বিরাট ইতিহাসে একমাত্র ও সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রই য়ুরোপের ভোগ-পুষ্ট বাস্তববাদী রাজনৈতিক দর্শন ও পন্থা নিয়ে অলৌকিক সংগ্রামের রূপ দেন।

ভারতের মাটিতে তাঁর এই প্রচেষ্টা পূর্বে সফল হয় নি, কিন্তু ভারতের বাইরে সার্থক হয়েছে, তার কারণ ভারতের মাটিতে য়ুরোপের ভোগবাদের আদর্শ কোন দিন বাসা বাঁধে নি, তাই অত্যাচারী বিদেশীর পদতলে নিজের জমি বিকিয়েও ভারতবাসী দু'শো বছর কাটাতে পেরেছে। কোনো কোনো অংশে খণ্ড খণ্ড জাগরণ এসেছে, কোথাও নিরস্ত্র কোথাও সশস্ত্র বিপ্লব দেখা দিয়েছে, কিন্তু একই সময়ে একই উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতি আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে ওঠে নি ; নইলে শুধুমাত্র সেই কম্পনেই পরস্বাপহারী বিদেশীয়রা ধূলিসাৎ হয়ে যেত। সে কম্পন জাগাতে পারতেন একমাত্র গান্ধীজী, কয়েকবার জাগিয়েওছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অভিযান নিজেই থামিয়ে দিয়েছেন ! রক্তাক্ত পথের ভয়ঙ্কর সম্ভাব্যতা তাঁকে ব্যাকুল করেছে। তাই নিরস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা, আপোষ দ্বারা তিনি এগিয়ে গেছেন—এ পথ সুদীর্ঘ জেনেও। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্রর শিক্ষা য়ুরোপের কাছ থেকে পাওয়া। সেখানকার বাস্তববাদী ভোগ-দর্শনের ওপর গঠিত রাজনীতি তাঁর। তাই নিজের প্রিয় জমি বিদেশী দখলকারীদের নির্বিবাদে এবং নির্বিচারে ভোগ করতে দিয়ে নিজেদের ত্যাগের পথ বেছে নিতে তিনি পারেন নি। যে ছল বল ও কৌশল দ্বারা বিদেশীরা তাঁর প্রিয় জন্মভূমি অধিকার করেছে, তাদেরই সেই ছল বল ও কৌশল দ্বারাই তিনি তাদের উৎখাত করবার আয়োজন করেছেন। এই দেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসে এই প্রথম দু'টি দ্বিমুখী বিরাট রাজনৈতিক মত ও পথ দেখা দিয়েছে। নিরস্ত্র ও সশস্ত্র অভিযান দু'টি আজ এক রাজনৈতিক মত ও পথ হিসেবে ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এর সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীর জীবনের মূল কেন্দ্রকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য। আজ নিরস্ত্র এবং সশস্ত্র রূপ নিয়ে যেটা রাজনৈতিক আকাশে দেখা দিয়েছে সেটাই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জাতীয়

জীবনে ত্যাগ ও ভোগের রূপ নিয়ে দেখা দেবে! নিরস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা গান্ধীজী ভারতের ত্যাগের ঐতিহ্যকে প্রকট করেছেন; সশস্ত্র সংগ্রাম করে সুভাষচন্দ্র ভোগের এক নতুন দর্শন ও আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। একজন চেয়েছেন ত্যাগের দ্বারা স্বাধীনতা, অপরজন ভোগের দ্বারা। গান্ধীজী এই সনাতন দেশেরই উপযুক্ত বংশধর, সুভাষচন্দ্র নবীন য়ুরোপের মূল উৎস ভোগবাদকে এই বৈরাগীর ভিটেয় রোপন করতে চেয়েছেন। যদিও গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগের আদর্শ স্বরূপ, এবং উভয়েই ভারতের সেই মৃত্যুহীন মন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু তবু উভয়ের কর্মধারায় ও দর্শনে মুখোমুখী প্রভেদ। ভারতের ত্যাগের মন্ত্র ও আদর্শ তার জন্ম থেকেই আজ অবধি পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে—গান্ধীজী তারই শেষ উত্তরাধিকারী মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। সুভাষচন্দ্র নবীন য়ুরোপের ভোগের মন্ত্র ও আদর্শ ভারতকে প্রথম দিলেন। তিনি নবীন ভারতের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। ভারতের ত্যাগের মাটিতে ভোগের প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর ক্রম বিবর্তনে প্রত্যেক জাতি ও দেশের উত্থান পতন হয়েছে; মিশর ইজিপ্ট ব্যাবিলন রোম গ্রীস ও চীনের সমসাময়িক দেশ জাতি ও এই ভারত—সকলের পতন হয়েছে, হয় নি শুধু চীন ও ভারতের। তার একমাত্র কারণ ভোগ বিলাসের যে প্রাচুর্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা রোম গ্রীসকে প্লাবিত করেছিল, সেই আদর্শ ও পথ চীন এবং ভারত কোনোদিন গ্রহণ করে নি। তাই তার এই সুপ্রাচীন সভ্যতা উনিশতকেও সগৌরবে টিকেছিল। কিন্তু চীনে ভাঙন ধরেছে—ভারতেও ভাঙনের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রম বিবর্তন অনুসারে যে পতন তার বহু পূর্বেই অনিবার্য ছিল—সেই পতন এতদিন তার ভিত্তিকে নাড়ায় নি, বিশ শতকে সে পতন দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীর চেয়ে ভাগ্যবান জাতি পৃথিবীতে বোধহয় আর নেই। তাই এই পতনের ঠিক প্রারম্ভে

সে পরপর পেল এমন সব মহাপুরুষদের—যাঁদের যে কোনো একজনকে যে কোনো সময়ে পেলেই সমগ্র জগৎ সৌভাগ্য বলে মনে করতো। ভারত ভাঙনের মুখেই প্রথম পেল রামমোহনকে, বিদ্যাসাগরকে বঙ্কিম, মাইকেল, বিবেকানন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রকে, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজীকে। এঁরা পতনের মুখটা রক্ষা করে গেলেন। কিন্তু তবু যেন পতনকে এড়ানো যাচ্ছিল না, তাই ভারতবর্ষ পেল সুভাষচন্দ্রকে। ভারতের বৈরাগ্য দর্শনের সঙ্গে তিনি ভোগের দর্শনকে যুক্ত করলেন। রাজনীতির আবহাওয়ায় তিনি যে নতুন মন্ত্র প্রাচীন ভারতবর্ষকে দিয়ে গেলেন, এ দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে তা মিশে যাবে, বৈরাগ্যের কষ্টিপাথরে ভোগের এই মন্ত্রই এই সুপ্রাচীন জাতি ও দেশকে ক্রমবিবর্তনের অনিবার্য পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে। বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্র সাধনের ওপরই সংযত ভোগবাদ গড়ে উঠবে।

আজ এই সুপ্রাচীন জাতি ও দেশ মৃত্যুর অনিবার্য হাত থেকে বেঁচে গেল। গান্ধীবাদের কৃচ্ছ্র সাধন ও সুভাষবাদের ভোগ দর্শন শুধু ভারতকেই নয়, পৃথিবীকে সভ্যতার এক নতুন আলোক দান করবে। কারণ ভারতের যেমন ভোগের অভাব পূর্ণ হল, তেমনি নবীন য়ুরোপের ত্যাগের অভাবও পূর্ণতা সাপেক্ষ। য়ুরোপকে ভারতের কাছ থেকে বৈরাগ্যের দীক্ষা নিতেই হবে—নইলে কেবলমাত্র ভোগ বিলাসের অসংযত স্রোতে য়ুরোপের বস্তু তান্ত্রিক সভ্যতা অচিরেই ধ্বংস হবে,—ভাববাদী ভারতকে নইলে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিষ্প্রভ।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ ও সুভাষবাদের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে এর সমন্বয় সাধন করতেই হবে এবং তা যে কোনো মূল্যে; নইলে ভারতবর্ষের পতন ঠেকানো যাবে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই মিলন সাধন হলেই ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রেও এই

সমন্বয় বৈরাগ্য ও ভোগের যুগ্ম দর্শন হাত মেলাবে। তাহলেই ভারতবর্ষ আবার তার বিগত ঐতিহ্য নিয়ে সসম্মানে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে, ভারত বাঁচবে, পৃথিবী বাঁচবে।

ভারতে ভাব ও জ্ঞানের চরম বিকাশ ঘটেছে বহু শতাব্দী পূর্বে, কর্ম সম্বন্ধেও তার পূর্ণ ধারণা ছিল। কিন্তু ছিল না তাকে রূপায়িত করার স্পৃহা—তার কারণ কর্ম হচ্ছে ভোগধর্মী—ত্যাগীর দেশে তাই কর্মবাদ ভারতীয় মনে প্রভাব বিস্তার করে নি। প্রাচীন যুগে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রথম ও শেষ কর্মবাদ প্রচার করেন ও এমন করেই প্রভাব বিস্তার করেন যার জন্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই দর্শন ভোগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিজের অধিকার ছলে বলে কৌশলে আয়ত্ত্ব কর, ত্যাগ কর না, এই ছিল পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর উপদেশ। তারই ফলে অত বড় কুরুক্ষেত্রের ধর্ম যুদ্ধ। পরবর্তী কালে ভারত শ্রীকৃষ্ণের এই দর্শন, এই ভোগবাদ ও কর্মবাদকে ভুলে গিয়েছিল, পূর্ণ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বিদেশী অভিযানকারীদের অনায়াসে আসতে দিয়েছিল নিজেদের ন্যায় অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করেও। বহু শতাব্দী পরে সুভাষচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সেই কর্মবাদকে য়ুরোপের বস্তুতন্ত্রবাদের আদর্শ অনুযায়ী নতুন করে রূপ দিয়ে ভারতবর্ষকে জাগ্রত করে গেলেন। ভাব ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল বহু পূর্বেই—এবার পূর্ণ বিকশিত কর্মবাদ ভারতবর্ষকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। এতদিনে এই বিশাল মহান ও সুপ্রাচীন দেশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

একদা এই দেশের সোনার লোভে পশ্চিম থেকে এসেছে গ্রীক পাঠান খিরগিজ তাতার মুঘল পোর্টুগীজ ফরাসী ইংরেজ, দূর পূর্ব দিক থেকে জ্ঞানের লোভে এসেছে চীন, জাপান মলয়া শ্যাম সুমাত্রা জাভা বোর্ণিও। আবার তারা আসবে, সারা পৃথিবীকে

আসতেই হবে এই দেশে, দস্যুর বেশে নয়, শিক্ষার্থীরূপে, যেখানে মাটির নীচে সম্পদ, ওপরে সম্পদ, আকাশে সম্পদ—সম্পদ সুপ্ত হয়ে আছে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাবলোকে জ্ঞানলোকে ও য়ুরোপ থেকে সংশোধিত কর্মলোকে।

ভারতবর্ষের কবি, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকেরাই শুধু নয় রাজারাও ছিলেন সন্ন্যাসী, সম্রাটেরা ছিলেন তপস্বী। তাঁরা রাজ্য শাসন করেছেন অস্ত্র দ্বারা নয়, রাজ্য বিস্তার করেছেন প্রেমের দিগ্বিজয়ী মন্ত্রে। তাঁদের রাজনীতিতে এ-কথা কোথাও বলেন নি, পর রাজ্য গ্রাস কর, লুণ্ঠন কর পরের দেশ কন্দর গাত্রে, প্রস্তর স্তূপে, স্তম্ভে, শিলালিপিতে খোদিত করে গেছেন মানব প্রেমের নীতি—যা শুধু ভারতের নীতিই নয়, সকল নীতির শ্রেষ্ঠ, তাই তার নাম রাজনীতি।

এই হল ভারতের রাজনীতি—শুধু অতীতেরই নয়, বর্তমানের এবং চিরকালের।

পে ভ্ মে ণ্ট ম্যা ন

কেভ্ম্যান থেকে পেভ্মেণ্টম্যান।

সময়ের ব্যবধান কয়েক শ' হাজার বছরের। বর্বর যুগ থেকে সভ্য যুগ। প্রস্তর যুগ থেকে এ্যাটম রকেট যুগ!

অরণ্যে পর্বত গুহাবাসী লোমশ মনুষ্যাকার প্রাণী কেভম্যান, সম্পূর্ণ নগ্ন; জংলী। তার সঙ্গে আজকের সভ্য শহরের ফুটপাথ জুড়ে যে সব অর্দ্ধ নগ্ন মানুষগুলির তফাৎ কি খুব বেশী? তফাৎ কি কয়েক হাজার বছরের?

কিছুকাল আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম একটি খবর। একটি ফুটপাথবাসী মধ্যবয়সী লোক তার একমাত্র শিশুপুত্রের ক্ষুধার অবিচ্ছিন্ন কান্না আর সহ্য করতে না পেরে সেই শিশুর পা দু'টি ধরে ধোপারা যেমন পাথরের ওপর কাপড় আছড়ায়, তেমনি করে ফুটপাথে আছাড় মারল, মুহূর্তে থেমে গেল শিশুর ক্রন্দন! মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। পথচারীরা জড়ো হয়ে লোকটিকে মারল কয়েক ঘা, পুলিশ এসে নিয়ে গেল তাকে ধরে! একমাত্র শিশু সন্তান হত্যার অপরাধে তার হল যাবজ্জীবন কারাবাস!

আমরা যে সভ্য! তাই এত বড়ো নৃশংস হত্যাকাণ্ড কি পারি সহ্য করতে! ক্ষমা করতে পারি কি সেই নিষ্ঠুর মানুষকে যে নিজের সন্তানকে নির্মম ভাবে হত্যা করে! এত বড়ো বর্বরতা পৈশাচিকতাকে ক্ষমা করবে আধুনিক সভ্যতাগর্বী মানুষ কোন্ নীতিতে?

আপনারাই বলুন কেভ্‌ম্যান থেকে পেভ্‌মেণ্টম্যান—কয়েক হাজার বছরে আমরা কতটা এগিয়েছি? কেভ্‌ম্যান ছিল বর্বর, কোনো পেভ্‌মেণ্টম্যান যদি ঐ রকম বর্বরতার পরিচয় দেয়—তাহলে আমাদের সভ্যতা টেকে কেমন করে!

বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার উচ্চ চূড়ে সমাসীন হয়ে আমরা অট্টালিকাবাসী। কেভ্‌ম্যান প্রাণী জগতের বিবর্তনের সৃষ্টি! পেভমেণ্টম্যান কার সৃষ্টি? বিধাতার? না, আপনার, আমার!

ক বি ফা ল্গু নী

পুরো ছ'ফুট লম্বা, গায়ে ঠাকুর্দার আমলের হাঁটু অবধি কালো কোট, গলায় জড়ানো রেশমী রুমাল, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, সারা মুখে পাউডার, বড় বড় ঢেউ খেলানো চুল—ফাল্গুনী রায়ের ছবি এক নিমেষে ভেসে ওঠে। সহরের সবত্র তার অবাধ গতি—টালা থেকে টালিগঞ্জে সে সুপরিচিত ফাল্গুনী রায় বলে নয়, 'পাগল' বলে। অনেকের ঠাট্টা বিদ্রূপ, টিট্‌কিরি কুড়িয়ে সে ঘুরে বেড়াত পথে ঘাটে, ট্রামে, বাসে এক পোষাকে, শীত-গ্রীষ্মে।

এই লোক কবি ছিল। অক্ষর মেলানো সখের কবি নয়। সত্যকার ক্ষমতাবান—জীবনে যার কাব্য ছিল সাধনার বিষয়। সে কবিতা খেয়াল খুশী মাফিক লিখত না, তার কবিতা আসত ভিতরকার প্রেরণা থেকে—উপলব্ধীর মধ্যে দিয়ে।

আজ যারা ফাল্গুনী রায়ের বন্ধু বা আত্মীয় বলে গৌরব করে, এমন একদিন ছিল যখন এদের ঠাট্টা তামাসা বিদ্রূপ তাকে অনেক সইতে হয়েছে; আঘাত মুখ বুজে গ্রহণ করতে হয়েছে। তারা সামনে তার সাজ পোষাক ও চাল চলনের প্রচুর প্রশংসা করে আড়ালে প্রাণ খুলে হেসেছে। তাই এই পৃথিবীর জন্যে অসীম বেদনা ও মানুষের প্রতি অপার বিতৃষ্ণায় তার মন দুর্বহ হয়েছে। ভালবেসেছে—প্রতিদানে ভালবাসা পেল না, শ্রদ্ধা করেছে কত মানুষকে, দেখেছে তারা শ্রদ্ধেয় নয়। বাইরের ভোল দেখে যেখানে মানুষকে দীন ভাবে, বাইরের মলিনতাকে যেখানে অন্তরের মলিনতা

বলে ভুল করে, সেখানে মানুষ কোন সভ্যতার বড়াই করে? মানুষ হয়ে মানুষকে না চেনার মতো মর্মান্তিক আর কি আছে? আশ্চর্য এই যে, এরাই সংসারে মানুষ আর ফাল্গুনীর মতো লোকেরা অপদার্থ, অমানুষ, উপহাসাস্পদ জীব!

এখানে কারো দোষ দিই না। এ জগৎ বিজ্ঞাপনের জগৎ। মেকি এখানে সাচ্চা বলে চলে, সাচ্চা ধূলোতে লুটোয়। সহজ সরল মানুষ বোকার সামিল, সত্যকে আঁকড়ে থাকতে যে চায় তার সততাকে লোকে সন্দেহ করে, আবার নিতান্ত কূটবুদ্ধি নৃশংস দুর্নীতিপরায়ণ লোক সৎ বলে শ্রদ্ধা পায়। মানুষ চেনা দুষ্কর।

তাই ফাল্গুনীকেও অনেকে চিনতে পারে নি। তার অন্তরের সৌন্দর্য কারো চোখে পড়ে নি। তার শিশু সুলভ সরলতা শুভ্র পবিত্রতা তার প্রাণখোলা হাসিতে উছলে পড়ত! কী সুন্দর সে হাসত! সে হাসি দেখলে দেখলে বোঝা যায় এর উৎস কোথায়।

সে ছিল অত্যন্ত খাম খেয়ালী। পথে প্রান্তরে নির্জনে জনারণ্যে তার খেয়াল বাঁধ মানত না। কত খেয়ালেই সে চলত! তার লেখার জন্যে কাগজের নিষ্প্রয়োজন। কাগজের ঠোঙার সাদা অংশ, ঘরের দেয়াল, হ্যাণ্ডবিল তার কবিতায় ভরে যেত। শেষ হলে তারা কোথায় পড়ে থাকত! কবি তার কোনো খোঁজই রাখত না! কোনো কাগজে বা খাতায় সম্পূর্ণ আকারে কোনো কবিতাই তার লেখা ছিল না। তার কবিতা থাকত মনের স্মৃতি-কোঠায়। আমরা শুনতাম মুখে—সে আবৃত্তি করে শোনাত একটির পর একটি! কত অল্প বয়সের কবিতা সে মৃত্যুর আগেও শুনিয়েছে।

সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে তার জন্ম। শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল উপযুক্ত। স্কুল কলেজের শিক্ষাকে সে শিক্ষার একমাত্র পন্থা বলে মেনে নিতে পারে নি, সে শিক্ষাধারাকে তার শিক্ষনীয়

মনে হয় নি তাই সে বাড়ীর চাপে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়লেও তার মুখে মুখে ফিরত সেক্সপীয়র থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য। এঁদের দান এঁদের সাধনা তার কাছে জীবনের চেয়ে অধিক ছিল।

হাস্য পরিহাসে, উপমায় অলংকারে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে, বুদ্ধি ও বিদ্যার দীপ্তিতে ফাল্গুনী আমাদের চমক লাগাতো। তার ব্যক্তিত্ব ছিল—সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারত। যা'রা তার সঙ্গে সহানুভূতি ও প্রীতির ভাব নিয়ে মিশেছে-তারা তাকে কখনো ভুলবে না, ভুলতে পারে না।

কোনো এক সাহিত্যিকের আসরে ফাল্গুনী উপস্থিত ছিল, কথা প্রসঙ্গে সেই সাহিত্যিক জিগ্যেস করলেন, 'ফাল্গুনী জীবনটা কেমন লাগে ?'

'সিগারেটের মতন !'

'সিগারেটের মতন !'

'হ্যাঁ সিগারেট বই কি ! জ্বলে জ্বলে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায়, পড়ে থাকে ছাইটুকু।'

শ্রোতারা তার জীবন-দর্শন শুনে অবাক !

এই উপমাই ছিল ফাল্গুনার মনের অকৃত্রিম সুর—বেদনা ও ব্যর্থতায় ভরা।

একবার তার এক লেখক বন্ধু নিজের একটি লেখা পড়ে শোনায়। শেষ হলে লেখক জিগ্যেস করে, 'কেমন লাগল ?'

ফাল্গুনী গম্ভীর গলায় বললে, 'ট্রেণ ফেল করে পরের ট্রেণের জন্যে ষ্টেশনে বসে থাকতে যেমন লাগে, ঠিক তেমনি।'

পাশাপাশি দু'টো ছবি ফাল্গুনীকে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করে। এমনি অসংখ্য ঘটনা কথাবার্তা।

প্রচণ্ড গরমের তাণ্ডব লীলায় ঘরের মধ্যে জানালাগুলি বন্ধ করে বসে আছি,—এত গরম যে কোনো কিছুতেই মন বসছে না, ফাল্গুনী

এসে উপস্থিত। তাকে দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। ভাবলুম যাক সময়টা ভালই কাটবে। সাগ্রহে বললুম, 'বস।'

বসেই ফাল্গুনী বললে, 'কী ঘরের মধ্যে বসে আছ চুপচাপ, চল বেড়িয়ে আসি।'

বলে কি! অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার কি মাথা খারাপ! এই গরমে আমি ঘরের মধ্যে টিকতে পারছি না, আর কি না বেড়াতে বেরুব!'

'দূর, ভালো লাগছে না, তাহলে উঠি।'

'সে কি! কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখি একটু বেড়িয়ে আসি।'

'না না যেও না! তোমায় সুখে থাকতে দেখি ভুতে কিলোয়। বস, বস।'

কিন্তু সে উঠে দাঁড়ালো। 'চল্লুম', বলে তার লম্বা পা ফেলে সে চলে গেল।

একবার ভাবলুম সঙ্গে যাই, কিন্তু বাইরের রোদের জ্বলন্ত রূপটা ঘরের মধ্যেই বেশ আঁচ করে সে ইচ্ছা তখুনি ত্যাগ করলাম।

তার পরদিন ফাল্গুনীর সঙ্গে দেখা। জিগ্যেস করলুম, 'কাল কি রকম বেড়ালে?' এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য যে আমি বিলক্ষণ জানতাম কাল ও ঘরেই ফিরে গেছে।

'ওঃ, দারুণ! ভবানীপুর থেকে সোজা শ্যামবাজার গেলুম হেঁটে, এলুম হেঁটে।'

'এ্যাঁ, কি বললে!'

ফাল্গুনী হাসতে লাগলো, বললে, 'যাক, কালকের উত্তাপে তোমার ননীর শরীর গলে নি দেখছি!'

বললাম, 'গলে নি যখন তখন বুঝতেই পারছ শরীরটা ননীর তৈরী নয়। কিন্তু তুমি কী?'

'আমি ?' সে উচ্চ হাস্য করে উঠল। 'বোধহয় মানুষ নয়।'

'সেই রকম বোধ হচ্ছে বটে!' আমার কথায় সে আরো জোরে হাসতে লাগলো।

এক সরস্বতী পূজোর দিন সকাল। রাস্তা দিয়ে আপন মনে হাঁটছি, কানে এল পরিচিত কণ্ঠ। চোখ ফেরাতেই দেখি পথের পাশে মাঠে সরস্বতী পূজোর অঙ্গনে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে ফাল্গুনী মহা উৎসাহে তখনকার এক জনপ্রিয় থিয়েটারের এক পার্ট আবৃত্তি করছে চিৎকার করে, চার পাশে বেশ ভিড়। সবাই হাসছে আর হাততালিতে রঙ্গস্থল মুখরিত হয়ে উঠছে!

মাঝে মাঝে ওকে বলতুম, 'দেখ তোমার ঐ ঢেউ খেলানো লম্বা চুল আর লম্বা কোটের মায়া ছাড়ো। আর কেন?'

'কেন? কেন?'

'কেন আবার! শীত গ্রীষ্মে ঐ মোটা আর লম্বা কোট যদি সমান ভাবে গায়ে চড়াও ত শীত গ্রীষ্মের তফাৎ থাকে কোথায়?'

'শীত-গ্রীষ্মের তফাৎ ত নেই-ই।'

'তোমার কাছে না থাকতে পারে, আমাদের পাঁচজনের কাছে আছে।'

'তা ত আছেই। কিন্তু আমি ত পাঁচজনের মতো নই।'

'নও বলেই ত ভাবনা।'

'ভাবনাটা কিসের?'

'পাঁচজনে যা করে তা যদি তুমি না কর, তাহলে তোমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান হয়ে উঠবে।'

'সুস্থতা! এ্যঁ!'

'হ্যাঁ, লোকে বলে তুমি 'পাগল'। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁট, ছোট ছেলেরা হাততালি দেয়, বড়রা হাসে। সেটা কি দেখতে পাও না?'

'দেখতে পাই বই কি!'

'তবে ?'

খানিকক্ষণ সে কোনো উত্তর দিল না। তারপর এক সময়ে অত্যন্ত নীচু ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে, 'দেখ, বর্তমান পৃথিবী ছদ্মবেশের পৃথিবী, বাইরের সাজ পোষাকে এ-পৃথিবীর মানুষ ভোলে, তাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে. ভেতরে তার কিছু থাকুক আর নাই থাকুক। এ আমাকে প্রবল প্রহার করেছে। তাই আমিও চাই না এ-পৃথিবীকে, আমি এই পৃথিবীকে করে যাব প্রচণ্ড ব্যঙ্গ।'

সে আবৃত্তি করে উঠল—

বুড়ী পৃথিবীর সজ্জা বহর দেখিলে লজ্জা পায়
থুরথুরে বুড়ী তুড়ি দেয় শুনি প্রভাতে প্রভাতী বায়।
সবুজ শাড়ীটি পেঁচিয়ে পরেছে জিরজিরে দেহ ঘিরে
হাসিছে আবার সবার সাথেতে সুমধুর ঝিরঝিরে।
কলকের ফুল নোলক পরেছে দোপাটি গুঁজেছে চুলে
পাতা কাটিয়াছে মস্‌করা করে, নেশায় নয়ন ঢুলে।
গান শিখিয়াছে কোকিলের কাছে কর্কশ ভাঙা গলে
গান গেয়ে ওঠে ঢঙ করে কত ন্যাকামীর ছলে।
দেখে যেন মনে হয়
খড়িঘসা মুখে বারাঙ্গনা সে থির চোখে চেয়ে রয়।
ধূলি ধূসরিত পা দু'টি ধুয়েছে ধবধবে নদী জলে
চোপসানো গালে চম্পক রেণু মাখিয়াছে পলে পলে।
চোখের কোলের কালো রেখাখানি নিমূল করেছে আগে
শুকনো অধর লালচে করেছে হিঙ্গুল শিমূল রাগে।
লজ্জা হয় না স্মরি
আজ বাদে কাল মহাকাল এসে লইবে জড়ায়ে ধরি।

একটানা আবৃত্তি করে থামল সে, তারপর বললে, 'কি রকম, বর্তমান পৃথিবীকে ঠিক মতো প্রকাশ করেছি ত। হাঃ হাঃ হাঃ।'

প্রচণ্ড শব্দে সে হেসে উঠল। তার সেই মন মাতানো প্রাণ খোলা শিশুর হাসি! তারপর স্বর বদলিয়ে বললে,

বাসনা আমার আকাশেরও চেয়ে বড়
রেখে যাবো আমি বহ্নি আখরে জ্বলন্ত স্বাক্ষর,
আমার সৃষ্টি দীপ্ত পরম স্মরণ স্তম্ভ হবে
সেই দম্ভেই লিখে যাবো আমি যতদিন বেঁচে রব।
কবি ফাল্গুনী এই নাম হবে দেখো,
দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত ধরণীর ধূলি 'পরে।

আমি চুপ করে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে ছিলাম। সে থেমেই আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললে, 'বাসনা ক-তো! এঁ্যা। আকাশের চেয়েও বড়! দম্ভ ক-তো! না, আমার সৃষ্টি দীপ্ত পরম স্তম্ভ হবে! কি বলো শেখর, হবে না কি! এঁ্যা! কি বলছে পাগলা কবি! না, না, পাগলা কবি নয়—শুধু পাগল! আমি পাগল!'

সে হাসতে লাগল খিল খিল করে।

বাল্যকালে সে তার মাকে হারায়। সে ছিল মায়ের অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে আদুরে। মার মৃত্যুতে সে যে আঘাত পেল, সেই বালক কালেই তা গুরুতর, যার ফলে সে নিজেকে সামলাতে পারে নি। আত্মীয় পরিজনরাও সংসারী মানুষ। যে ভালবাসা, যে যত্ন সে তার মার কাছ থেকে পেয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ কে করবে? অত্যন্ত অভিমানী সে, তাই সে স্নেহের জন্যে, ভালবাসার জন্যে লালায়িত হয়েছে। তার মনে হত, এ মানুষের ন্যায্য দাবী মানুষের কাছে, কিন্তু তার কিশোর মন জানত না এ পৃথিবীতে স্নেহ ভালবাসার কোনো দাবীই কখনো কারো ওপর খাটে না! জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না। তাই সেও

তার মনের মতন পাওয়া কারো কাছে পায় নি। উপরন্তু তার কবি স্বভাবের দরুণ নিষ্কর্মা অপদার্থ বলে ধিক্কৃত হয়েছে। আর এই অবহেলা, এই নিষ্ঠুরতা তাকে কষ্ট দিত বরাবর সেই বাল্যকাল থেকেই। তার পরবর্তী জীবনের ভিত্তি এরই ওপর। তাই আমরা দেখতে পাই দুর্দান্ত প্রাণশক্তি ও সৃজনী ক্ষমতা ছিল বলেই পৃথিবীর এই নিষ্ঠুরতা, এই অন্যায়কে সে আর পাঁচজনের মতন মুখ বুজে স্বীকার করতে পারে নি। অন্য মানুষের পায়ের সঙ্গে নিজের পথ মিলিয়ে চলবার মত মানসিক গঠন তার ছিল না। তাই পৃথিবীর প্রতি তার বিমুখতা, তার অভিমান এমন বিকৃত রূপ নিয়ে দেখা দিল, যা শুধু তার মনকে নয়, তার কথাবার্তা, পোষাক পরিচ্ছদ চাল চলন লেখা সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করল। এর হাত থেকে সে আমরণ নিষ্কৃতি পেল না।

আগেই বলেছি সম্পূর্ণ আকারে কোনো কবিতা লিখে রাখা ফাল্গুনীর ধাতে ছিল না। তার যে সমস্ত কবিতা তার জীবিত-কালে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সে সবই প্রায় আমরা জোর করে তাকে দিয়ে লিখিয়ে অথবা নিজেরাই লিখে পাঠিয়েছি। তার কাছ থেকে একবার এক বন্ধুস্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক কিছুতেই লেখা আদায় করতে না পেরে তাকে ধরে এনে নিজের ঘরে টেনে আনলেন। বললেন, 'এই নাও কাগজ কলম, লিখে দাও।'

ফাল্গুনী পড়ল মহা বিপদে, বললে, 'আজ থাক, কাল নিশ্চয়ই দেব।'

সে ভদ্রলোক ফাল্গুনীর 'কাল' বিলক্ষণ জানতেন, বললেন, 'না এখনি চাই। নাও লেখ, আমি দরজা দিয়ে যাচ্ছি। ফিরে যেন পাই।'

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সে ভদ্রলোক যখন আবার সে ঘরে গেলেন ফাল্গুনী একটি কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে বললো, 'উঃ এই নাও।'

একটি অপরূপ কবিতা সে লিখে দিয়েছে।

অনেক সময়ে আমি তাকে বলেছি, 'তোমার সমস্ত কবিতাগুলি একত্র করে ছাপাও না কেন? আর নাই যদি ছাপাও ত সব লিখে রাখতে দোষ কি?'

'ওরে বাবা!' সে আমার প্রস্তাব সেখা'নই চাপা দিয়েছে।

একটি মেয়েকে সে ভালবেসেছিল। ফর্সা, সুন্দরী, পড়ত আশুতোষ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে। ভোরে কলেজ মেয়েদের। সে আসতো গড়িয়াহাট থেকে। কলেজ যখন ভাঙত দশটার সময়ে, মেয়েটি উঠত বালীগঞ্জের ট্রামে। ফাল্গুনীও ঠিক সেই সময়ে উঠত সেই ট্রামে। মেয়েটির অপেক্ষাতেই সে দাঁড়িয়ে থাকতো কলেজের সামনে কলেজ ভাঙার আগে।

মেয়েটি নেমে যেত গড়িয়াহাটের মোড়ে। ফাল্গুনীও নামতো সেই সঙ্গে। তারপর অবশ্য মেয়েটির সঙ্গ নিত না সে। মেয়েটি তার বাড়ীর রাস্তা ধরলেই সে ভবানীপুরে ফিরত হেঁটে। এই ছিল তার নিত্যকার কাজ। এক দিন নয় দু'দিন নয়, দীর্ঘকাল। মেয়েটির সঙ্গে তার আলাপ ছিল না। কোনোদিন সে না ট্রামে, না পথে তার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়েছে! ভাল লাগত তাকে— ভালবাসত তাকে। তার নামটি সে শুনেছিল তার সহপাঠিনী ট্রামের সঙ্গিনীদের মুখে—কাজরী! এই নাম তার সর্বক্ষণের জপমালা ছিল! এত যে মিশুক, এত সরল, এত উচ্ছল সে—কোনোদিন সে কাজরীর কাছে এগিয়ে যায় নি, কথা বলে নি। কাজরীও তাকে দেখত রোজ। বুঝতো সব, কিন্তু একজন স্বভাব লাজুক কবি, অন্যজন নারী! কোনোদিন একটি কথাও হল না তাদের মধ্যে। অথচ তারা পরস্পর যে পরস্পরকে ভালবেসেছে—এ কথা তারা দু'জনেই জানতো! কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশ পেলো না কখনো, মূর্ত, সবাক হল না তাদের মধ্যেকার নিবিড় নীরব প্রেম!

আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য তার প্রেম! তার তরুণ জীবনের সমস্ত কবিতার উৎস ও প্রেরণা কাজরী।

চুপচাপ একা জানালায় কেন
কাজরী?
কাজ কি এ সব উদসীনতায়?
এসো না!
নীল দুধে ধোয়া ধবধবে সাদা রাত
রাস্তাটা যেন ঝকঝকে ইস্পাত!
এই হাতে রাখো রাঙা ভেলভেট হাত
রাখো গো!
অগাধ অবাধ এলোমেলো পথ
দেখেছি
ধূ ধূ করে শুধু ধূসর ধূলোরা
সুদূরে!
হলুদ হ্রদেরা গান গায় আনমনে
শ্যামল শ্যাওলা সারাক্ষণ তাই শোনে
জলের আলাপ লাগছে কি সুন্দর
জানো না!
চাঁদ শুয়ে আছে দেখ বরফের
বিছানা
ঝিলিমিলি হাসে রাতের রেশমী
রোদেরা
ঝরণার ঝাড়ে মরমর করে বন
ঝাউ-ঝাড়ে ঝাড়ে ঝিঁঝিঁদের ঝন্‌ঝন্‌
এ-মন এমন অকারণ উন্মন
কেন গো?

ঘুম গলে যায় মোমের মতন
অঝোরে
শার্সী-আরসী ভিজে গেছে জ্যোৎস্নায়
রঙিন কাঁচের পিছল মাছের' নায় !
সোনালী খাঁচার ক্যানারীরা তন্দ্রায়
আহত !
হাওয়ারা বাজায় পাইনের বনে পিয়ানো
ঘাস শীষে শীষে শিশিরের শিশ
শুনছ ?
মাঠে মাঠে ঘন বেগুনী আগুণ জ্বলে
ভায়োলেট ফুল ফুলকির মতো ঝলে,
তরল তুষার টুপটাপ ঝরে পড়ে
নীরবে !
কথায় কথায় রাত ডুবে যায়
আকাশে,
তবু একা বসে জানালার ধারে
বিমনা !
চাঁদ ফিরে গেল তারার ঝালর নেভে
কখন কাজরী দ্বারে করাঘাত দেবে ?
শুনবো কখন কাঁকনের কিনিকিনি
কি জানি !

কোনোদিনও কাজরী কবির দ্বারে করাঘাত করে নি ! ফাল্গুনী শোনে নি তার প্রিয়ার কাঁকনের কিনিকিনি।

পরিবর্তে বাজল প্রচণ্ড শব্দে যুদ্ধের দামামা। সারা পৃথিবী মেতে উঠল রণে। সে আওয়াজে ডুবে গেল কবির সব কবিতা, তার প্রেয়সীর কাঁকনের কিনিকিনি ! জাপানী বোমা পড়ল কলকাতায়।

শহর ছেড়ে যারা সেই যুদ্ধের ডামাডোলে ছিটকিয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে, দূর প্রান্তে—ফাল্গুনীর পরিবার তাদেরই অন্তর্গত। তারা গেলেন মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে। ফাল্গুনীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে যেতে হল। সে যাবার আগে আমার ইচ্ছে হল তার সমস্ত কবিতা লিখিয়ে নেবার। কিন্তু অসম্ভব কুঁড়ে সে। তাই নিজেই ভার নিলাম তার কবিতাগুলি রক্ষা করার। সমস্ত কবিতাই ছিল তার কণ্ঠে—সে বলে যেত একে একে, আমি লিখে নিতাম।

কান্দীতে গিয়ে সে শান্তি পাচ্ছিল না। ছটফট করছিল কলকাতায় ফিরে আসার জন্যে। আমরা তার স্বল্প অন্তরঙ্গ বন্ধু যারা তাকে বুঝতাম—তাদের মাঝখানে সে ফিরে আসতে চাইত। এমন সময়ে ধরল তাকে কঠিন টাইফয়েড রোগে। সেই রোগেই অত্যন্ত তরুণ বয়সে কান্দীতে তার মৃত্যু।

যুদ্ধের প্রচণ্ড দামামা যখন বাজছে, আকাশ বাতাস যখন মুখরিত কামানের আর বোমারুর দাপাদাপিতে—তখন ফাল্গুনী লিখেছিল একটি কবিতা—তার শেষ কবিতা, যুদ্ধের পটভূমিতে।

যাবার আগে একদিন সে উপস্থিত হল আমার কাছে। বললে, 'শেখর, একটি কবিতা লিখলাম কাল, তোমাকে শোনাতে এলাম। অনেক ি ষ্টি কবিতা ত শুনেছ। এবার শোনো টক কবিতা।'

হেসে বললাম, 'অর্থাৎ বলতে চাও—

মাটিতে যখন আগুন জ্বলে,
আকাশে তখন কি ফাগুন চলে ?

সে হাসতে লাগল, তারপর বললে, 'Well said my boy! Very well said?'

তারপর একটু থেমে বললে, 'একদিন শুনিয়েছি—

এখানে চলেছে মৃদু আলাপন স্বপনের চাউনির,
আছে সুগন্ধি শ্যামল শালের আর ঘন-বন-ঝাউ-নীড়,
গহীন ছায়ার স্নিগ্ধ বিছানা-পাতাদের ছাউনির,
ঘন-বন-ঝাউ-নীড় !

সে থামল একটু, তারপর বললে, 'আজ অন্য কবিতা। ঝড়ের কবিতা ! মানুষ মানুষকে মারছে, অস্ত্র দিয়ে. বোমা দিয়ে নিঃশেষ করছে সব কিছু স্বপ্ন ও সাধনাকে ! সভ্যতাকে ! শেখর, গত ন'রাত আমি ঘুমোতে পারি নি ! অসহ্য যন্ত্রণা এই বুকের মধ্যে ! • জ্বালা, জ্বলে যাচ্ছে ! কিছু বলার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলাম। তারই ফল 'মরু ঝড়'।

সে গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করে উঠল—

মরু ঝড় যে রে ক্ষেপে গেছে আজ ভীষণ অট্টরোল
ও বেদিয়া আর দেরী নয় মোটে মোট ঘাট সব তোল।
আগুন। আগুন। আকাশে আগুন লাল মেঘ ঝলসায় :
সূর্যের চোখে বল্লম হেনে মরু-ঝড় গরজায়।
হাজার হাজার ঘূর্ণি ঘোড়ারা পৃথ্বি চূর্ণ করে
শৃঙ্খল টুটে খলখল হেসে ছোটে বিদ্যুৎ ভরে।
কী গণ্ডগোল ! জাগল পাগল ঘোরতর ঘর্ঘর-এ,
তুঙ্গ শিখর পর্বত ফাটা হুংকার বর্বর-এ।
আগুন ! আগুন ! আগল ভেঙেছে আগলে কি হবে আর ?
ভিত্ থরথর চৌচির চিরে ঐ তার চিৎকার !
থাক, পড়ে থাক অনেক পিছনে অশ্রু পিছল চোখ
ধ্বংস ভয়াল গহন অন্ধে যাত্রা মোদের হোক,
তোল্‌রে তোল্‌পী তোল্
ঘরের বাঁধন সাধন কাঁদন আজকে ও সব ভোল।

একটু থেমে সে আবৃত্তি করে চলল—

আহা। সাদা চাঁদ ফোয়ারা ঢালবে, হালকা হাওয়ার হাসি
রেশমী রঙিন রাত নিয়ে যাবে ফুল্ল ফুলের ফাঁসী।
আহা। কত সাধা, কানে কানে কথা মুখে মুখে মুখ রাখা
কানায় কানায় পূর্ণ কামনা মানে নাকো কোনো ঢাকা।
হামেসা তামাসা কুমারীর কাম-কুমীরকে তাতিয়ে দিয়ে
তাঁবুর ভিতরে ইতরের মতো রাতকে মাতিয়ে দিয়ে।
চোখ নেচে ওঠে দেখে খসখসে পশমের পেশোয়াজ
'আল্লা কশম, কথা আছে শোনো, এই দিকে এস আজ।'

ফাল্গুনী থেমে একটু হেসে বললে, 'বুঝলে শেখর,

মিথ্যে কশম, কথা কিছু নেই, কাছে ডেকে আনা শুধু
শিকারী শ্যেনের পাষণ্ড ক্ষুধা লেলিহান জ্বলে ধুধু।
আলতা-লালচে টসটসে ঠোঁটে রস চুষে নেওয়া খেলা
বুকে টেনে তুলে তুলতুলে তুলো বুকখানা উঁচু ঠেলা।
ঝিলিমিলি নীল নিতল নয়নে চেয়ে চেয়ে অপলক
নয়নের কোণে ঘুম-ঘন-হ্রদ বেলোয়ারী ঝকমক।
বেদেনির গিঁঠে আঁচল বেঁধেনি, দিল বড় আঁকা বাঁকা
মেয়ে মানুষের প্রেম ! সাবানের ফানুস ফাঁকা।
আজকে ওসব ভোল্
ঘরের বাঁধন সাধন কাঁদন, তোল্‌রে তোল্‌পী তোল্।

ফাল্গুনী থামল, আবৃত্তি করতে করতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, মুখখানি লাল হয়ে উঠল ক্রমশ চোখ দু'টি জ্বলতে লাগল, তারপর বললে, 'শেখর, এ ত চাই না, দীঘল আঁখি আর রঙিন ঘাঘরা মানায় না এই ধ্বংস যজ্ঞে। আজ—'

সে আবৃত্তি করে উঠল সুললিত কণ্ঠে—

কটি'তে তোমার কোটি সূর্যের তলোয়ার ঝলসাক
বহু যুগ-জমা-মরণ- মরচে পুড়ে পুড়ে হোক খাক।